শুধু রূপকথা নয়

সতী কুমার নাগ

পরিবেশক :
সাহা বুক ষ্টল
৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশিকা :
সন্ধ্যা সাহা
"সাহিত্য কুঠির"
হাবড়া
২৪ পরগণা

দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৭০

মুদ্রক :
শ্রীমধুমঙ্গল পাঁজা
নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস
১৬, মার্কাস লেন
কোলকাতা-৭০০০০৭

আমার কথা

ছোটদের গল্প শুধু ছোটরাই পড়ে না। বড়রাও পড়ে। বড়োদের ভাল লাগে। তাই কি করে বলি, এসব গল্প ছোটদের। গল্পের ছোটো বড়ো বলে কিছু নেই।

ভালো লাগাটাই হলো বড়ো কথা।

সতী কুমার নাগ

সূচীপত্র ঃ—

আমার বন্ধু

আজ আমি তোমাদের কি গল্প বলবো, বল তো ? দাহু বললেন। নিজের দাড়িতে হাত বুলালেন, আর কি যেন একটু ভাবলেন। বেশ, আমি তোমাদের আমার এক বন্ধুর কথা বলছি।

"কে ?"—নাতি নাতনীরা প্রশ্ন করে।

যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতো ; আমিও তাকে খু-উ-ব ভালোবাসতাম।

"কি তার নাম ?"—আবার তারা প্রশ্ন করে।

"এই তো বলছি। চুপটি করে বসো। কেউ কোন কথা বলবে না।"—এই বলে দাহু তাঁর গল্প বলা শুরু করেন।

ভোর হয়েছে। জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য উঠেছে···তার লাল আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে পূর্ব-আকাশে সমুদ্রের ওপারে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়···সমুদ্রের জাহাজের আনা-গোনা। ঘরের সামনে গাছ। সব গাছের নামও জানি না। বাইরের জগতের সঙ্গে তো আমার কোন যোগাযোগ নেই। ছোট ঘর। নির্জন নিরালা।

আমি এ-ঘরটিতে থাকি। এক, দুই করে অনেক বছর কেটে গিয়েছে। যতদূর চোখ যায়, ততদূর দেখি। দেখি, সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক পাখি। কোথায়, কতদূর কে জানে ? চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ভাবি, আমারও যদি ডানা থাকতো, তবে আমিও উড়ে যেতাম···অ-নে-ক দূরে আকাশের সঙ্গে মিশে যেতাম। ওরা কত সুখী ! সত্যি ওদের দেখে হিংসে হতো—।

"দাহু সকালে কিছু খেতে না ? ছোট নাতনী প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ সকালে জেলের জেলার খাবার পাঠাতো রুটি, জেলি আর

চা। কতদিন রুটি খেয়ে বাকী টুকরো রেখে দিয়েছি ছোট টেবিলটির ওপরে। চায়ের কাপে মুখ দিয়েছি, ঠিক এমনি সময়ে একটা পাখি··· সাদা···গায়ের পালকগুলো সাদা···আমার ঘরে এসে ঢুকল ছোটো জানালাটির ফাঁক দিয়ে। টেবিলের আধ-টুকরো রুটির ভালটুকু ঠুকরে খেতে লাগলো। আমি ওকে বাধা দিলাম না।

"পাখিটার কি নাম দাদু?" এবার ছোট নাতি প্রশ্ন করে। "পাখিটার কি নাম জানি নে। আমাদের সাদা পায়রা দেখেছো তো? ঠিক তেমনি দেখতে ঐ পাখিটা। যতটা পারলো পাখিটা খেলো। খানিকটা টুকরো আবার ঠোঁটে করে নিয়ে গেল। আমি ওকে বললাম, তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু হলে। তুমি আবার এসো ঠিক এমনি সময়ে। আমি তোমার জন্য রুটি, জেলি রাখবো। আমার আমন্ত্রণ সে গ্রহণ করেছিল। সে ঝুঁটি নেড়ে তার সম্মতি জানালো। মনে হল বলল, আবার আসবো বন্ধু।"—দাদু এখানে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন।

"বক্ বক্ করে উড়ে গেলো গাছ-পালা ছাড়িয়ে, সমুদ্র পেরিয়ে কতদূর কে জানে? তারপর, আমি যতটা পেরেছি, জানালার শিক ফাঁক করে দিয়েছি। সত্যি, আমার খুব আনন্দ হল এমন এক বন্ধুকে পেয়ে। ঐ নির্জন কারাকক্ষে শুধু আমি একা! কেউ আমার সঙ্গী-সাথী নেই।

তারপর দিন। আমি ওর জন্য রুটির ভালো অংশটুকু রেখে দিয়েছি। জেলার দয়া করে আমাকে একখানা রুটি বেশী দিতেন।—"

"তোমার বন্ধু আর এলো না?"—নাতি-নাতনীরা প্রশ্ন করে।

সেই কথাই বলছি।—দাদু শুরু করছেন আবার বলতে···আমার মনে হল, আমার বন্ধু হয়ত আর আসবে না। কিন্তু, আমার বন্ধু এল। তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালাম, এসো আমার বন্ধু। এবার আমার বন্ধু গলা ফুলিয়ে, শরীর দুলিয়ে, বক বক করে আমাকে প্রীতি জানাল

ঘরে ঢুকেই খেতে শুরু করে দিল। খুব ধীরে ধীরে খুঁটিয়ে খেতে লাগল। আমি সেই ফাঁকে তাকে আমার মনের কথা বলতে শুরু করলাম। বন্ধু দেখতে পাচ্ছ, আমি কত অসুখী। তুমি তো জানো না, আমি আমার দেশ ছেড়ে কত দূরে আছি একা। আমার বাড়িতে ফুলের বাগান আছে, ফলের বাগান আছে ফসলের মাঠ আছে। বাগানে কত রকম ফল—আম, জাম, লিচু, কলা, পিচ সব পাকা।

'হুম'। বলে সে শুধু একটা শব্দ করলে। আমার কথা যেন সে বুঝতে পেরেছে, বলে ঝুঁটি নাড়লো।

শীত আসে। তখন কুয়াসায় চারিদিক ঢাকা। এমন কি গাছ-পালাও কিছু দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু কুয়াসার জালি ছড়িয়ে আছে। তখন আমার ভারী অসুবিধে হয়। তখন আর আমার বন্ধু আসে না।

শীত চলে যায়। বসন্ত ঋতু আসে। এবার আমার বন্ধু শুধু একা আসে না। সঙ্গে করে আরো তিনজনকে আনে। তারা খুব ছোট কচি। বুঝতে দেরী হয় না। ওই কচি বাচ্চারা আমার বন্ধুর ছেলে-মেয়ে।

আমার ভারী আনন্দ হল ওদের দেখে। উঃ, কতদিন পরে আমার বন্ধু এল। ওরা আসতেই নির্জন ঘরখানা মুখর হয়ে ওঠে। আমিও যেন প্রাণ ফিরে পাই। আমি যে কি করব, না করব, ঠিক করতে পারি না।

রুটির একখানা টুকরো হাতে নিয়েছি। হাত থেকে রুটির টুকরো ছিনিয়ে নেয়—বাচ্চাদের খেতে দেয়। বাচ্চাগুলোও আমার হাত থেকে রুটির টুকরো কেড়ে খেল।

'ভারী হ্যাংলা তো!' —নাতনীরা বলে উঠলো।

হ্যাঁ, গোটা টুকরোটাই গিলে ফেলে। আমার ভারী ভালো লাগছিল। আবার ওরা চলে গেল। সেই গাছপালা ছাড়িয়ে, সমুদ্র পেরিয়ে. যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর আমি তাকিয়ে থাকি। এরপর থেকে দেখেছি, ওদের কারো আর ভয়ডর ছিল না।

একদিন দেখা গেল, ওরা আর আসছে না। কেন? আমি রোজ ভেবে মরি। রুটি ওদের জন্যে রেখে দিই। ওদের আসা-পথের দিকে চেয়ে থাকি। দেখতে দেখতে বেলা বয়ে যায়। আর ওরা আসে না। আমি ভাবি, আমি কি ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। আমার মন খারাপ হয়ে যায়। রোজই ভাবি, আজ আসবে।

এমনি করে তিনটি মাস কাটল।

একদিন ওরা এল। কচি বাচ্চারা এখন বেশ বড় হয়েছে। আগের মতোই ওরা জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকল। সোজা আমার টেবিলের উপর এসে বসলো। ওদের আদর করলাম। বললাম, তোরা আসিস নি কেন রে? ওরা কিন্তু বেশী কিছু খেল না। ঘরের আনাচে কানাচে রুটির টুকরো আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। কি যেন কথা বলতে চায়। তাই তো—সেই সাদা পাখি যে আমার ঘরে প্রথম দিন অথিতি হয়ে এসেছিল। যাকে আমি প্রথম বন্ধু বলে ডেকেছিলাম—ওদের মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

প্রশ্ন করলাম: তোমাদের মা কোথায়? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

ওরা তিনজনেই ঝুঁটি নেড়ে আমার কথায় সায় দিল। পরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বেশ স্পষ্ট দেখলাম, ওদের তিনজনের চোখ কেমন সজল। আবার প্রশ্ন করলাম: মার কি অসুখ হয়েছিল? এবার তিনজন একসঙ্গে ঝুঁটি নেড়ে আমায় বুঝিয়ে দিলে, হ্যাঁ, মার অসুখ হয়েছিল।

বুঝতে দেরী হল না, ওদের মা মারা গিয়েছে। তাই কেউ ওরা আসে নি। মার পরিচয় নিয়েই ওরা আমার কাছে এসেছে। ওরা জানতো, আমি ওদের মাকে ভালোবাসতাম। ওদের মাও ওদের কাছে আমার কথা বলেছে। আজ আমার বেশ মনে পড়ে, কতদিন আমি ওর মায়ের সঙ্গে কত কথা বলেছি। আমার চোখ দু'টি ছলছল্

করে ওঠে। আমার মনে হল, এ যেন আমারই আত্মীয়বিয়োগ বেদনা। আমি ওদের সহানুভূতি জানালাম। আমি বললাম, তোমাদের মায়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। রোজ আসতো ঠিক এমনি সময়ে। ওরা ওদের মায়ের কথা আগ্রহভরে শুনল। আমি বললাম, তোমরা রোজ এমনি সময়ে আসবে কিন্তু! ওরা চলে গেল সেদিন।

একটু থেমে দাছু নিজের কথা বললেন। দেশকে ভালবেসেছিলাম। বিপ্লবীদের নায়ক ছিলাম। ধরা পড়লাম। বিচারে আন্দামানে পাঠাল। সেই দ্বীপের নির্জন বন্দী-ঘরে বছরের পর বছর কেটে গেল। এর মধ্যে নিজের দেশে কি ঘটেছে, না ঘটেছে, কিছুই জানি নি। তারপর একদিন আমার বন্দী-ঘরের দরজা খুলে গেল।

সকালবেলা। ছু'জন সার্জেন্ট এল আমার ঘরে। ঘোষণা করল আমায় ডেকে, মিষ্টার লিডার, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে। এই দেশ, হ্যাঁ, আজই এ কালাপানির দেশ থেকে তোমাকে তোমার দেশে যেতে হবে। তৈরী হয়ে নাও—জাহাজ ঘাটে ভিড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেলি। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমার বন্ধুব কথা, বন্ধুব ছেলেমেয়ের কথা। যেদিন আমি চলে আসি সেদিন আমি ওদের দেখতে পাই নি। হয়তো আমার ঘরে নতুন মানুষ দেখে ফিরে গিয়েছে।

ফিরে এলাম আমার দেশে, আমার বাড়িতে।

সকলে বলে উঠলো, তারপর?

এখানেই শেষ হলো দাছুর গল্প বলা।

নতুন পল্লীর ডাক্তার

বিনু ইস্কুল থেকে ফিরে আসে। ইস্কুলের বইগুলো টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে। তারপর, হাত-পা, মুখ-চোখ ভালো করে ধোয়। তার বিকেলের খাবার এক বাটি দুধ।

বিনু দুধের বাটি রেখে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা' আমি এ দুধ খাবো না, খাবো না!'

'কেন রে? কি হয়েছে?' মা তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন, পাশের ঘর থেকে।

'এই দেখ না। বাটির চারিদিকে কত নোংরা।'

মা দেখলেন তাই তো!

মেয়ের বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখে মা মনে মনে ভারি খুশী হন।

এদিকে কি হয়েছে তাই বলি।

ছোড়দা খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসেছে। দু'বন্ধু ছোড়দাকে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে এসেছে।

মা জিগ্যেস করেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে, 'কি হয়েছে?'

ছোড়দা কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, 'বল খেলতে গিয়ে'—

'ও মা!' ভয় পেয়ে মা আঁতকে ওঠেন। কি করবেন না করবেন—কিছুই ঠিক করতে পারেন না।

বিনু বললো, 'মা বরফ এনে ছোড়দার পায়ে দাও। দেখো, ফুলো, ব্যথা এক্ষুণি সেরে যাবে। ছোড়দার সামনে ও-রকম করবে না। ওতে ছোড়দা আরো ভয় পাবে।'

মা তখনই বরফ আনতে পাঠালেন। রামু চাকর বরফ কিনে ফিরে এলো। বরফের টুকরো ছোড়দার পায়ে কিছুক্ষণ দেওয়া হলো।

সত্যি, খানিক পরে দেখা গেল, ফুলো কমে আসছে, পায়ের ব্যাথাও তেমন নেই। ছোড়দা বললো, 'অনেক কমে গেছে, মা।'

'সত্যি, বরফের কথা আমার মনেই ছিল না' মা বললেন।

বিমু বললো, 'জানো মা, আজ দিদিমণি বলে দিয়েছিলেন, পায়ে চোট লাগলে বরফ দিতে।'

ও ঘর থেকে পিংকি কেঁদে ওঠে। 'দেখ তো বিমু পিংকির আবার কি হলো?' মা বললেন।

বিমু ছুটে গেল। 'পিংকি কি হয়েছে রে? কি করে আঙুলে লাগলো? দেখি, রক্ত পড়ছে। ব্লেড দিয়ে পেনসিল কাটতে কে বলেছিলো?'

মা-ও এসে হাজির হলেন। রক্ত দেখে মা আঁতকে উঠলেন।

'দেখেছো, কি রক্ত! উঃ, কি করে হলো?'

'মা, অমনি করলে পিংকি ভয় পাবে। ওঃ, কিছু নয়। দেখ না, এখনি সেরে যাবে।' এই বলে বিমু খানিকটা জলে এক টুকরো নেকড়া ভিজিয়ে নেয়। ঐ ভিজে নেকড়া ওর কাটা নখের আঙুলে জড়িয়ে দেয়। সত্যি রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

মা বিমুর বুদ্ধি দেখে প্রশংসা করেন।

'মা, বিপদে পড়ে কখনো ঘাবড়াতে নেই। আচ্ছা মা, বলতো, আগুনে হাত পুড়ে গেলে কি করবে?'

'তুই বল না, শুনি।' —হাসতে হাসতে মা বললেন।

'বাতাস করতে নেই, এমন কি সেখানে জলও দিতে নেই। বাড়ীতে নারকেল তেল থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তা দিলে ভাল হয়। ঘরে যদি স্পিরিট থাকে, তা ঢেলে দিলেও চলে। পরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

মা শুনে বললেন, 'ঠিক বলেছিস, বিমু।'

এমনি সময় মণ্টু কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হয়।

'কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে তোর?'

'মা, টুনোদা এই দেখ না!' বলে নিজের কানটা দেখায়।

'সত্যি, দেখেছো, মন্টুর কানের পাতা কেমন লাল হয়ে উঠেছে।'

বিনু টুনোর কাছে গিয়ে বলে, 'টুনি, তুমি মারলে কেন?'

'মারবে না তো কি করবে? দেখ না, আমার পেনসিল নিয়েছে।'

'তা, বলে ওকে কানে মারবে?—জানো, কানের পরদা কত পাতলা, কানের আঘাত কত কিছু বিপদ ঘটতে পারে।' বিনু টুনোকে বকে। মন্টুকে আদর করে। বিনু মাকে বলে, 'জানো না, কানের পরদা ছিঁড়ে গেলে কালা হয়ে যাবে। আর শুনতে পাবে না।'

মন্টুও তেমনি কাঁদ-কাঁদ সুরে বলে, 'বড্ডো ব্যাথা করছে, মা।'

'ওর কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে!' মা টুনোকে বকেন, আর বিনুকে হাসি মুখে বলেন, 'তোর বুদ্ধিশুদ্ধি দেখে খুশী হয়েছি।'

'মা' আমি বড় হয়ে ডাক্তারী পড়বো। বড় ডাক্তার হবো।' বিনু বলে।

'বেশ তো! তোকে ডাক্তারীই পড়াবো।' মার কথা শুনে বিনু ভারী খুশী হয়। আনন্দে হাত তালি দিয়ে বিনু বলে ওঠে, 'কি মজা হবে রে—কত ছেলেমেয়েকে ভালো করবো!'

বিনু এখন বড় হয়েছে। ডাক্তারী পাশ করেছে সে। বিনু এখন নতুন কম্পানীর ডাক্তার। কত ছেলেমেয়ে তার কাছে আসে। সবাই আসে রোগ সারাতে। কেউ বা আসে দাঁত দেখাতে। দাঁতে তাদের পোকায় ধরেছে। আবার কেউ বা আসে চোখের রোগ সারাতে। এমনি ধরনের কত রকমের রোগ আছে যাতে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা ভোগে। যাদের মা-বাবার পয়সা নেই, তাদের কাছ থেকে বিনু কোন পয়সা নেয় না। বিনা পয়সায় সে তাদের রোগ দেখে। এমন কি, নিজের পয়সা দিয়ে বিনু তাদের খাবারও কিনে দেয়। তার দেওয়া ওষুধে সবাই ভালো হয়ে যায়।

নতুন পল্লীর মানুষেরা বিনুকে ভালোবাসে। এখন নামকরা

ডাক্তার সে। সবাই তাকে চেনে।

সেদিন আমাদের ভারত সরকার থেকে সংবাদ এসেছে, বিন্নু বিদেশ যাচ্ছে পড়াশুনা করতে। হ্যাঁ, ডাক্তারী পড়তে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা কেন রোগে ভোগে, তাদেরই কথা জানতে।

বিন্নু এখন নতুন পল্লী থেকে বিলেত গিয়েছে। মন দিয়ে সেখানে পড়াশুনা করছে। সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিন্নু নাম করেছে বেশী। আসছে মাসে তার পরীক্ষা। পরীক্ষা হয়ে গেলেই সে দেশে ফিরবে।

সবার আগে বিন্নু যাবে নতুন পল্লীতে। সেখানকার ছেলেমেয়েদের আগে দেখবে—দাঁত, নখ, চুল, চোখ, কান।

টুটুলের গল্প

টুটুলের বাগান। কত রঙ বেরঙের ফুলই না ফুটেছে।

ওই দেখ না, সূর্যমুখী ফুলটা। কেমন হলদে, পাপড়ী ছড়ানো। আবার সূর্যের দিকে মুখ করে কেমন তাকিয়ে আছে।

খুব ভোরে টুটুল ওঠে।

সবার আগে বাগানে যায়। চারাগাছগুলোর গোড়ায় সে জল ঢালে। পরে আশেপাশের আগাছাগুলো তুলে ফেলে। টুটুল জানে ওই আগাছাগুলোই চারাগাছগুলোকে বাড়তে দেয় না।

আজ টুটুল চারা গাছেও জল ঢালে না। আগাছাগুলোও তুলে ফেলে না।

টুটুল কি করলো জানো? সূর্যমুখী ফুল গাছটার কাছে গিয়ে বসে। বোঁটাসহ সূর্যমুখী ফুলটা গাছ থেকে তোলে। পরে গোটা ফুলটা দু' হাতের তালুর মধ্যে রাখে। পরে বেশ, দুমড়ে মুচড়ে পাঁপড়িগুলো ফেলে দেয়।

ভারী মজা তো।

দুধের মতো সাদা এক রকম রস বের হয়। একটু হাওয়াতেই তা শুকিয়ে যায়। টুটুলের হাতের আঙ্গুলগুলো দেখ না কেমন হলদে ছোপ। তাই সে ওঠে হাত দুটো ঝরণার জলে ধোয়।

কচি নরম ঘাস ছড়িয়ে আছে চারদিকে। টুটুল এবার ওই বিছানা ঘাসের ওপর শুয়ে থাকে। কি সুন্দর সবুজ নরম ঘাস।

ওর চোখে পড়ে মাথার উপরকার নীলাকাশটা। সূর্যের আলো তার চোখে ঠিকরে পড়ে। পাশ ফিরে শোয় সে। বাঁ হাতটা মাথায় ভর দিয়ে থাকে। একটু পরে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ডানার ঝটপটানি শব্দে টুটুল জেগে ওঠে। ওই যে আতা-গাছটা। ওর পাশে ঝোপটা। সেখানে থেকেই আসছে শব্দ। একটু পরে ওই ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে একটা ফিঙে পাখি। ওই গাছের ডালে ও বাসা বেঁধেছে। গাছের গুঁড়িটা খুব মোটা। তা নইলে টুটুল এখনই গাছে চড়তো। ফিঙের বাসায় ক'টা ডিম ফুটেছে, তা সে দেখতে পেতো। বেচারা! গাছে চড়তে পারে না। পাখির ছানাও সে দেখতে পায় না।

সহসা এক ঝলক হাওয়া বয়। গাছের শুকনো পাতাগুলো ঝুরঝুর করে তার চোখে মুখে পড়ে। এমনি সময়ে একটা পাখি কুহু কুহু করে ডাকে।

পাখিটা ডেকে বলে, 'টুটুল, তুমি কি আমার কথা ভুলে গেছ? তুমি আমায় চিনতে পারছ না?

পাখিটাই বলতে থাকে, আমি তো তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। জান তো, আমি ঠিক এ সময়েই আসি। বসন্ত আসছে কিনা।

এবার টুটুল বলে ওঠে, বাঃ তা আর জানি নে। তাই তোমার নাম দিয়েছি বসন্তের দূত। এতদিন ছিলে কোথায়?

আমরা বরফের দেশে থাকি। বসন্ত ঋতু আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাদের দেশে আসি। কত নদনদী, কত সাগর, কত বন-উপবন, কত পাহাড় পেরিয়ে আসতে হয়। গত বছর এই গাছটায় বাসা বুনেছিলাম। তোমার মনে আছে তো?

তা আর মনে নেই! তোমরা কি দিয়ে বাসা বানাও? জিগ্যেস করে টুটুল।

তা বুঝি জান না? খড়কুটো, লতাপাতা দিয়ে বাসা বানিয়ে থাকি, সেবার ফিরে এসে দেখি, কে আমার বাসা ভেঙ্গে দিয়েছে।

বাবলু, তুতুল ওদের চেনো তো? তোমার বাসায় কটা ডিম তা দেখতে ওরা গাছে চড়েছিল।

টুটুলের এ কথা শুনে কোকিলের হাসি পায়।

'তুমি বুঝি জান না?' এ বলে কোকিল বলতে থাকে, আমি তো আমার বাসায় ডিম রাখি না। আমার ডিম কাকের বাসায় চুপটি করে রেখে আসি।

ওরা বুঝি চিনতে পারে না? অবাক হয়ে টুটুল জিগ্যেস করে।

বাঃ, তা কি করে চিনবে? কাকের ডিমের মতো হুবহু দেখতে আমার ডিম। কাকের বাসাতেই কাকের ডিমের সঙ্গে আমার ডিমও ফোটে।

ভারী মজা তো। তারপর তোমার বাচ্চারা তোমার কাছে ফিরে আসে তো? উৎসুক হয়ে টুটুল জিগ্যেস করে।

তা আর আসবে না? মাকে ছেড়ে কি কখনো ওরা থাকতে পারে? এ বলে কোকিল একটা শিষ দেয়।

টুটুল ভাবে কাক দেখতে কালো, কোকিলও কালো। কাক ডাকে 'কা' 'কা' আর কোকিল ডাকে 'কুহু' 'কুহু,' কাকের ডাক ভারী বিশ্রী। কোকিলের ডাক কি সুন্দর! ভারী মিষ্টি। কালো হলে হবে কি? কোকিলের গুণ আছে বলেই সবাই ওকে ভালোবাসে, আদর করে, পোষেও!

কোকিল টুটুলকে ডেকে বলে, 'হ্যাঁ কি যেন তোমাকে বলছিলাম, এই তোমার বাগানের কথা। তোমার বাগানটি আমার সত্যি ভারী ভালো লাগে। এবার দেখছি, আরও নতুন নতুন ফুলের গাছ তোমার বাগানে।'

টুটুল কোকিলকে সংবাদ দিতে ভুলেই গিয়েছিল। কোকিলকে ডেকে বলে। ওই দেখ আমার ডালিয়া ফুলগাছের সারি। গত বছর ফুলের মেলাতে এই ডালিয়া ফুল দিয়েছিলাম। আমার ডালিয়া প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল।

এ সংবাদ শুনে কোকিল ভারী খুশী হয়। টুটুল, আসছেবার

যখন আসবো, তখন তোমার জন্য সোনালী পাতা নিয়ে আসবো। কোকিল বলে।

: সোনার মত বুঝি দেখতে? জিগ্যেস করে টুটুল।

: হ্যাঁ! সোনার মতো ওর রঙীন পাতাগুলো! তাই ঐ গাছকে অনেকে বলে 'সোনালী গাছ।'

: 'আমার জন্য একটা চারা আনবে?'

: তা কি করে আনবো, টুটুল? গাছের চারা আনা সহজ নয়। ঐ গাছ যে শীতের দেশে হয়।

: তাই তো—'টুটুল আপন মনে ভাবে।'

: টুটুল, তুমি ভেবো না। পাতা তো আর ভারী নয়। খুব হালকা। আমি ঠোঁটে করেই তা নিয়ে আসতে পারবো। কোকিল বলে।

: বেশ তো। তাই এনো : কোকিল, তুমি সত্যি বড়ো ভালো! টুটুল, তুমিও খুব ভালো। তোমার বাগানটি বড় নিরিবিলি। ঐ যে সামনে ফাঁকা বড়ো মাঠটি রয়েছে। ওখানে কত রকম পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। আমি ওদের চেয়ে অ-নেক অ-নেক দূরে উড়ে যেতে পারি। শহরের ঐ যে বড়ো বড়ো চিমনীগুলো দেখা যাচ্ছে যেন আকাশ ছোঁয়া। আমি একটি নিমেষে ওগুলো পেরিয়ে যেতে পারি। কেউ আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়তে পারবে না। টুটুল, আমি এখন ঐ নদীর ওপারে উড়ে যাচ্ছি।—এ বলে কোকিল 'কুহু' 'কুহু' ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়। টুটুল কোকিলের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটু পরেই টুটুলের চোখে পড়ে একটা রঙিন প্রজাপতি। পাখনা মেলে ফুর ফুর হাওয়ায় প্রজাপতিটা এ ফুল থেকে ও ফুলে উড়ে বেড়ায়। টুটুল ওটাকে ধরতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে প্রজাপতিটা ধরতে হাত বাড়ায়। ভারী চালাক প্রজাপতিটা। একটু টের পেয়েই প্রজাপতিটা ওখান থেকে সরে পড়ে। টুটুলের সামনে দিয়ে প্রজাপতি ওই পুকুর পাড়ে উড়ে যায়।

বাগনের বাইরে পুকুরটা। সেও বাগানের গেট পেরিয়ে

প্রজাপতি পিছু পিছু ধাওয়া করে। টুটুলের কি খেয়াল আছে? আর একটু হলেই সে সামনের খাদে পড়তো। পায়ে হোঁচট খায় সে। সে আর ছুটতে পারে না।

পুকুর পাড়ের বটগাছটার তলায় সে বসে পড়ে। প্রজাপতি হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক দূরে উড়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে সে দেখতে পায় একটা ছোট পাখি। পাখিটা উড়ে আসে টুটুলের দিকে।

টুটুল সেই ছোট্ট পাখিকে ডেকে বলে ঃ ও পাখি আমার কাছে আরেকটু এগিয়ে এসো না?

পাখি টুটুলকে বলে ঃ তোমার বুঝি মনে নেই? গত বছর তুমি কি করেছিলে? তোমার বাগান বাড়ির ঐ গাছটাতে আমি বাসা বুনেছিলাম—

তুমি তোমার বন্ধুকে একটা মই আনতে বললে সে একটা মই নিয়ে এলো। তারপর মই বেয়ে উপরে উঠলো। ডিম পাবে কি করে ডিম তো তখন ছিল না। এতে আমার বউ ভারী দুঃখ পেয়েছিল। বউ আমাকে বলেছিল ঃ আর কখনো তোমার এখানে ফিরে আসবে না।

দুঃখ করে টুটুল বলে ঃ সত্যি, আমি ভারী দুঃখিত। এখন তো এখানে বেড়াতে এসেছো।'

অনেকদিন পর তোমার এখানে বেড়াতে এসেছি। আবার যদি কখনো খারাপ কাজ কর, তবে আর কখনো আসবো না, দেখো।

—এ বলে সে একবার টুটুলের দিকে এগিয়ে আসে, আবার পিছু দিকে পা বাড়ায়।

ঃ আরেকটুক এগিয়ে এসো না? তোমার কি সুন্দর, তুলতুলে নরম গা। আমার ইচ্ছে করে তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করি।

এ কথা শুনে পাখিটা বলে। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে

আমার ভারি ভয় লাগে। তোমার কাছে গেলে যদি তুমি আমাকে আটকে রাখ—। টুটুল, তোমার পকেটে দেখছি, এক গাদা পালক ওগুলো দিয়ে কি করবে?

: কি আর করবো? এগুলো বাড়ি নিয়ে যাবো। তারপর সাদা পালকে তুলি দিয়ে লাল রঙ বুলাবে, আর এযে দেখছো কালো পালক—এ লাল আর কালো পালক দিয়ে মুকুট বানাবো।

ঃ তোমার কথা শুনে ভারী হাসি পায়। ঐ মুকুট দিয়ে কি করবে?—

ঃ বাঃ, আমি মুকুট মাথায় পরবো।

টুটুলের কথা শুনে ব্যাঙ্গ করে পাখিটা বললো ঃ বেশ মানাবে তোমাকে। তোমার বুদ্ধি দেখে ভারি হাসি পায়।

ওর কথা শুনে টুটুল যায় রেগে। তার হাতের কাছে ছিল পাথরের কুচি। সেটা হাতে নিয়ে পাখিটার দিকে ছুঁড়ে মারে। ভাগ্যিস, ওর গায়ে লাগেনি। পাখিটা আর সেখানে থাকলো না সে পাখা মেলে উড়ে যায়, অ-নে-ক, অ-নেক দূরে।

টুটুল ওর উড়ে যাবার পথের দিকে অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকে।

তারপর টুটুল কি আর করে?

বটগাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ঐ নীল আকাশটা। সারা আকাশটা নীল আর নীল। মনে হয় নীল আকাশটা তার হাতের কাছেই।

টুটুল ভাবে একটা বড়-লম্বা মই বেয়ে যদি ঐ আকাশটা ধরে আনা যেত তবে কি মজাই না হতো।

তারপর, টুটুল বটগাছটার তলায় শুয়ে থাকে। —এক ঝলক হাওয়া বয়ে যায়। গাছের শুকনো পাতাগুলো ঝুরঝুর করে পড়ে টুটুলের চোখে মুখে। উঠে বসে সে। দেখতে পায় একটা কাঠবেড়ালী বটগাছটার গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করছে

তারপর, টুটুল এ-দিক ও-দিক তাকায়। বাগানে নানা রঙের ফুল ফুটেছে। আবার আরেক দিকে বাগানে কত রকম ফলের গাছ।

টুটুল দেখতে পায়, ফুলের চারিদিকে একটা মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। আর আপন মনে গুণগুণ করছে। টুটুল ভাবে, মৌমাছিটা গুণগুণ করে কি কথা বলছে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে—ঐ মৌমাছিটার দিকে। মৌমাছি ফুলের মধু পান করছে।

মৌমাছি এ ফুলে ও—ফুলে উড়ে বেড়ায়। টুটুল মৌমাছিকে ডেকে বলে, ও মৌমাছি, তুমি আমার বাগানে থাকবে?

বেশ তো! তার আগে তুমি আমাকে কথা দাও।

কি কথা বল।

দেখ, আমি খুদে মৌমাছি। আমি তো একা উড়ে বেড়াই না। আমরা দল বেঁধে, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াই। একটু পরে ঐ পাহাড় থেকে মৌমাছিরা দল-বেঁধে এ-দিকে উড়ে আসবে। শীতের দিনে আমরা কি করি জান?

ঃ কি কর তখন?

ঃ আমরা তখন দল বেঁধে থাকি। এ সময়টা আমরা গাছের ডালে ঘরের থামে বা কড়িকাঠে ঝুলে থাকি। তখন কিন্তু আমরা উড়ে বেড়াই না। আমরা এ সময়টা শুধু ঘুমিয়ে কাটাই।

ঃ তাহলে কখন তোমরা জেগে থাক?

ঃ বসন্ত কাল এলেই আমরা আবার জেগে উঠি। তারপর, মধুর খোঁজে উড়ে বেড়াই ফুলে ফুলে। ঐ ফুল থেকে আমরা মধু আহরণ করি। জানো আমাদের মৌচাকে ছোটো ছোটো খুপরী আছে। তাতে মধু ভরা থাকে। ঐ মধু আমাদের ছেলেমেয়েরাও খায়।

প্রশ্ন করে টুটুল ঃ তোমাদের মা নেই?

টুটুলের কথা শুনে মৌ-মাছিটা হেসে জবাব দেয়—বারে, তা বুঝি নেই? রাণী মৌমাছি যে আমাদের মা!

: তাই নাকি! ঐ চাকের খোপে খোপে তো ডিমগুলো থাকে?

: হ্যাঁ, গরমের দিন এলেই ডিমগুলো ফোটে। ওরা আবার কি করে জানো? ওরা নিজেদের গুটিয়ে রাখে রেশম গুটির মতো। বেশ কিছুদিন ও-ভাবে ওরা ঘুমিয়ে থাকে।

টুটুল ভারী অবাক হয় মৌমাছিদের কথা শুনে।

: তারপর?—প্রশ্ন করে টুটুল।

: তারপর আর কি?—তেমনি করে মৌমাছি থাকে। ঐ খোপ থেকে একদিন ওরা বেরিয়ে পড়ে। সেবার কি হয়েছিল জানো, টুটুল? সে বছর আমাদের চাকে বড় ভীড় হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা তখনো ভালো করে ডানা মেলতে পারিনি। একদিন রাণী মৌমাছি আমাদের সবাইকে ডেকে বললো: চল, আমরা এখান থেকে আরেক জায়গায় যাই।

টুটুল খুদে মৌমাছির কথা অবাক হয়ে শুনেছিল।

: টুটুল তোমার বাগানে থাকতে পারি, তার আগে কথা দাও যা বলবো, তা শুনবে?

: বল না আমায় কি করতে হবে?

: আমাদের মৌচাকের ধারে কাছে এসে কখনো দুষ্টুমি করবে না। এমন কি তোমার বন্ধুদেরও চাকের ধারে আসতে দিবে না।

: তুমি যা বলবে, তা আমি শুনবো।

টুটুলের কথায় মৌমাছি ভারী খুশী হলো।

: টুটুল ঐ দেখ ওরা দল-বেঁধে পাহাড় থেকে তোমার বাগানের দিকে উড়ে আসছে।

কি সুন্দরই না পাহাড়ী জায়গা!

পাহাড় আর আকাশ যেন কত কাছাকাছি!

নীল আকাশ বুঝি পাহাড়ের সাথে মিতালী পাতিয়েছে। টুটুল যদি একটিবার ঐ পাহাড়টির মাথায় উঠতে পারত···তবে কি মজাই না হতো! তার ইচ্ছা হয় ঐ পাহাড়টির উপর উঠতে।

তাই তো? মৌমাছির ঝাঁক কোথায় গেল? চারিদিকে তাকায় টুটুল।

ঐ যে ওরা দল বেঁধে বাগানেরই দিকে আসছে।

টুটুল ওদের ডেকে বলে, তোমারা আমার বাগানে থাক না কেন?

রাণী মৌমাছি টুটুলকে বললো, তুমি ত আগেই শুনেছো ঐ খুদে মৌমাছির কাছ থেকে সব কথা!

: হ্যাঁ, শুনেছি। আমি তো কথা দিয়েছি।

: বেশ...তোমার এখানেই বাসা বুনছি...রাণী মৌমাছি বললো।

একটা বড় আমগাছের দুটো ডালে মৌমাছিরা বাসা বাঁধে। চাকের খোপে মধু...বাসার চারপাশে অগুনতি রাণী মৌমাছির ছেলেমেয়েরা। ওরা পাহারা দেয় মৌচাকে।

সত্যি, টুটুল কখনো দুষ্টুমি করেনি। বন্ধুরাও দুষ্টুমি করে চাকে নাড়া দেয়নি। তাই ওরা টুটুলকে হুল ফুটায়নি।

টুটুল ভালোবেসে মৌমাছিদের পোষে, আদর করে। আবার তেমনি ওরাও টুটুলকে ভালবাসে। ওরা টুটুলকে ভালোবেসে মধুও খেতে দেয়।

তোমাদের গল্পের শেষ কথাটুকু বলছি—

তোমরা টুটুলের বাগানে গেলে দেখতে পাবে, একটা আমগাছের দুটো ডালের পাশাপাশি দুটো মৌচাক ঝুলছে। ওরা চাকের চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—গুন গুন করে।

সাবধান! মৌচাকে কিন্তু খোঁচা দিও না!

গহীন বন। সহজে কেউ এ বন পেরুতে পারে না। দূর থেকে দেখে মনে হয়, দৈত্যপুরীর দেশ—মিশমিশে কালো দানবগুলো ঝাঁকড়া মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। এ বনের ভিতর কি আছে না আছে, এ কথা কেউ জানে না। কি করেই বা জানবে? কেউ কি কখনো দেখেছে? যাক্‌গে, এসব কথা! যে কথা সবাই জানে, সেই কথাটাই বলছি। গহীন বনের পথের বাঁকে থাকে এক রাখাল। ওখানে বসে সে ভোর থেকে সাঁজ অবধি বাঁশী বাজায়। আবার কখনও কখনও জ্যোস্না রাতও কেটে যায় ঐ বাঁশী বাজিয়ে।

অঞ্জনকুমার আসছে ঐ পথ ধরে। ঐ গহীন বন পেরিয়ে অঞ্জনকে যেতে হবে অচিনপুরীতে। মাঝপথে পড়বে তেপান্তরের মাঠ। তারপর নীল সাগর। সাগরের এ-পার থেকে দেখা যায় না ও-পারের কিছু। শুধু দেখা যায়, অচিনপুরীর শ্বেত পাথরের প্রাসাদের চূড়ো। এই শ্বেত পাথরের প্রাসাদের কত ইতিহাসই না জড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের কথা কেউ জানে না! রাজ-রাজাদের ইতিহাস হ'লে এতদিনে পাথরের গায়ে লেখা হয়ে থাকতো—সে যুগের কাহিনী! এ যুগের ছেলেমেয়েরা তা আবার ছাপার হরফে পড়তো। কিন্তু এ সব কথা কি সত্যি? না তা নয়! তবে রূপকথার ব্যাপারে এমনি হয় কিনা!

আমাদের রূপকথার নায়ক অঞ্জনকুমার রাজপুত্র, কোটালপুত্র নয়; সে তোমার মত-ই একটি সুন্দর ছেলে। বুকে বল, মনে সাহস, চোখে জ্যোতি—অঞ্জনকুমারের। হাতে তার তীর-ধনুক আর পরিধানে আর্যপুত্রের যুদ্ধের পোষাক!

অঞ্জনকুমার এসে পৌঁছায় সেই গহীন বনের বাঁকে।

জ্যোস্না রাত লুটোপুটি খায় বনানীর দেশে। ঐ বনের বাঁকে

সেদিন রাখাল আপন খেয়ালে, আপন খুশিতে বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। অঞ্জনকুমার ঐ বাঁশীর সুরের টানে এক পা' দু'পা করে এগিয়ে আসে।

চারিদিক নীরব, নিঝুম! শুধু মেঠো বাঁশীর সুর! অঞ্জনকুমার ডাকে: 'তুমি বুঝি বাঁশী বাজাচ্ছো ভাই?'

'হ্যাঁ ভাই—তুমি কে ভাই?'

'আমার নাম অঞ্জনকুমার। আমি চলেছি অচিনপুরীর দেশে। সেখানে শ্বেত পাথরের ঘর আছে; সেখানে কাজল-গাঁয়ের কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘ বরণ চুল বিছিয়ে সারা আকাশ ছেয়ে যেন শুয়ে আছে। সেই পাষণপুরী থেকে কুঁচবরণ কন্যাকে উদ্ধার করতে চলেছি। 'তুমি বলে দিবে ভাই, এ গহীন বন কি করে পেরিয়ে অচিনপুরীর দেশে যাবো?'—এই কথা বলে অঞ্জনকুমার রাখালের পাশে বসে।

এক পলক দৃষ্টি রাখালের অঞ্জনকুমারের দিকে। আলতো একটা শ্বাস ফেলে সে। শেষে রাখাল বলে, 'তোমার আগে, অনেক আগে অনেক রাজপুত্র, কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্র এই পথ দিয়েই গিয়েছে অচিনপুরীর দেশে, কিন্তু তাদের মধ্যে আজও কেউ ফিরে আসেনি! তুমি কি পারবে ভাই, অঞ্জন?'

অঞ্জনকুনার একটু হেসে ব'লে ওঠে, 'রাজকুমার, নবাবকুমার পারেনি বটে কিন্তু আমি অঞ্জনকুমার পারব, জেনো।' তুমি শুধু আমাকে পথের নিশানা বলে দাও।—দেখ, কি মজার কথা! তোমার নাম কি, সে কথাই জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি!'

'আমার নাম রাখল। এই গহীন বনের ধারেই আমার কুটীর। এখানে বসেই বাঁশী বাজাই।'—এই বলে আবার বাঁশী বাজাতে শুরু করে রাখাল। গহীন বনের নীরব, মৌনতা, মুখরিত হয়ে ওঠে রাখালের বাঁশীর সুরে। সারা বন যেন বাঁশীর মেঠো সুরের ঢেউ-এর দোলায় দুলে ওঠে।

রাখালের বাঁশীর মূর্ছনার পরশ পেয়ে বুনোগাছের লতা-পাতা

আনন্দে যেন শিহরিত। রাখালের বাঁশীর মাধুর্যে বনের পশুদের চলনশক্তি থেমে আসে। পাখিরাও পাখনা মেলে উড়তে ভুলে যায়। বনের যে যেখানে থাকে, সবাই রাখালের বন্ধু, মিত্র, সহচর। অনেকে বলে, 'এ বাঁশী নাকি ভেল্‌কি জানে, যাদু জানে!' রাখাল বলে, 'অঞ্জনকুবার আমার একটা কাজ করবে? তুমি যখন ফিরে আসবে আমার জন্য একটা লাল কমল আনবে?'—

'কেন আনবো না, ভাই? নিশ্চয়ই আনবো, রাখাল। লাল কমল কোথায় পাবো, তা আমাকে বলে দাও।'

'অচিনপুরীর দেশে কাজল-দীঘি আছে সেই কাজল-দীঘির জলেতে হাজার হাজার লাল কমল ফুটে রয়েছে দেখবে। সেই দীঘির জলে ফোটা লাল কমল আমার চাই। পারবে কি আনতে?'—

অঞ্জনকুমার হেসে বলে ওঠে, 'তা আর পারবো না। ভাই ঐ ফুল দিয়ে কি করবে তুমি?'

'সে অনেক কথা ভাই! আমাদের এ রাজ্যের রাজার রাজকন্যার জন্মদিন উৎসব ছিল। রাজকন্যে বায়না ধরলেন লাল কমলের। কোথায় পাবে সে-লাল কমল? রাজা চারিদিকে লোক পাঠালেন। কেউ সে লাল ফুল সংগ্রহ করতে পারলে না। তারপর রাজা ঘোষণা করলেন, যে এনে দেবে লাল কমল তাকে রাজা দেবেন অনেক পুরস্কার। সেই থেকে রাজকন্যের জন্মদিন উৎসব বন্ধ হয়ে আছে।—'

'এ আর এমন কি কঠিন কাজ?'—

'অঞ্জন, আমি তোমাকে আমার বাঁশীটি উপহার দিচ্ছি। 'এ বাঁশীর সুর যে শুনবে, সেই ঘুমিয়ে পড়বে।'—এই বলে অঞ্জনকে বাঁশীটা রাখাল উপহার দেয়।

'তোমার এ বাঁশী দিলে, তুমি আবার কোথায় পাবে বাঁশী?'— অঞ্জনকুমার প্রশ্ন করে।

'এ ছাড়াও আমার সঙ্গে আরেকটি বাঁশী আছে, এই দেখ!' এই বলে রাখাল তার ঝোলা থেকে আরেকটি বাঁশী বের করে দেখায়।

দু'জনের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

দেখতে দেখতে রাতের রূপালী চাঁদ ওঠে। অনেক রাতে রাখাল বিদায় নেয়। অঞ্জনকুমারও বিদায় নেয়। বিদায় বেলায় অঞ্জনকুমার বলে, 'আজ থেকে তুমি আমার বড় বন্ধু, মিতা।'

রাখাল অনেকক্ষণ অঞ্জনের চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে থাকে। এক সময় দেখা যায়, রূপালী চাঁদের আলোতে রাখালের দু'চোখের দু'ফোঁটা জল মুক্তার মতো চক্‌চক্‌ করে ওঠে। রাখাল নিঃশব্দে একটা শ্বাস ফেলে। এ তার গোপন বেদনার ছোট্ট কাহিনীটুকু কেউ জানে না। এই অঞ্জনকুমারের মত এর আগে যারা এ পথ দিয়ে গিয়েছে, তারা সবাই রাখালের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে আজও কেউ ফিরে আসেনি। আজকের দিনে রাখালের সে সব কথা বার বার মনে পড়ে।

অনেক রাত। জ্যোস্‌নার আকাশে ফিকে চাঁদ। চাঁদ ঘুমে যেন ঢুলে পড়েছে। অঞ্জনকুমার চলতে পারছে না, সেও যেন ক্লান্ত, অবসন্ন, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এক সময় একটা গাছের তলায় অঞ্জনকুমার বসে। অঞ্জনের চোখ দু'টো ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ গহীন বনের দু'একটি পাখীর কলরব, পাখনার আওয়াজ শোনা যায়। গাছ থেকে ঝরে-পড়া শুকনো পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসে।

ঠিক এমনি সময়ে গাছের ডাল থেকে একটা হীরামন পাখি ডেকে উঠে।

হীরামন : অঞ্জন, অঞ্জন ! রাত শেষ হয়ে এলো—উঠে পড়ো !—

অঞ্জন : (হীরামনের ডাকে অঞ্জনকুমার জেগে ওঠে) কে, কে আমাকে ডাকলে ?

হীরামন : আমি হীরামন পাখি। যারা এ পথ দিয়ে যায়, আমি তাদের পথ দেখিয়ে দিই। কোথা যাবে তুমি ?

অঞ্জন : আমি যাব অচিনপুরীর দেশে। সেই অচিনপুরীর

শ্বেত পাথরের ঘরে বন্দিনী হয়ে আছে—কাজল গাঁয়ের কুঁচবরণ কন্যা। তাকে উদ্ধার করতে চলেছি। আচ্ছা হীরামন, কোন পথে সে দেশ পাবো, বলবে আমায় ?

হীরামন : শাল পিয়ালে বন,
পেরিয়ে পাবে তেপান্তর।
ঢেউর পর ঢেউ তুলে,
চলছে উজান সাগর।
দূর হতে যায় দেখা,—
বিশাল পুরীর দ্বীপান্তর।
বন্দিনী সেই কুঁচবরণ কন্যা
আছেন সেথা একা।

অঞ্জন : তুমি কি করে পাখী হলে—বলবে আমায় ?

হীরামন : সে অনেক কথা একদিন আমার সৎমা আমার মাথায় কি একটা ওষুধ দিয়ে দিলেন—সে থেকে আমি পাখি হয়ে এ বনেই বাস করছি।

অঞ্জন : কি করলে আবার তুমি ভাল হতে পার, বলবে আমায় ?

হীরামন : অচিনপুরীর যে দ্বীপ-সাগর রয়েছে, জল আমার মাথায় দিলে আবার আমি ভাল হয়ে উঠবো।

অঞ্জন : হীরামন, আমি তোমার জন্যে সাগরের জল নিয়ে আসবো তুমি এখানে থেকো, কিন্তু।

হীরামন : অঞ্জন, এই-ফলটি তোমাকে দিচ্ছি। যখন খিদে পাবে, তেষ্টা পাবে, তখন একটু একটু করে ভেঙে খেও। দেখো খিদে আর তেষ্টা থাকবে না।

ঠিক এমনি সময়ে গাছের পাতাগুলি খস্‌খস্ করে ওঠে আর একটা শাঁই শাঁই শব্দ শোনা যায়।

হীরামন : অঞ্জন, অঞ্জন, শীঘ্র পালিয়ে যাও।

অঞ্জন : কেন কি হয়েছে ?

হীরামন : এই পথ দিয়ে একটু পরেই একটা বিশাল অজগর যাবে—
উঃ ! সে ভীষণ অজগর অঞ্জন, আব দেরি করো না।
হীরামান পাখি অঞ্জনকুমারকে এ কথা বলে উড়ে যায়
—আপন মনে শিস্ দিয়ে।

তারপর—কত পাহাড়, কত নদ, কত নদী, কত বন, কত উপবন পেরিয়ে, একদিন অঞ্জনকুমার এসে পৌছায়—সেই অচিনপুরীর দেশে! অচিনপুরীর কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে—কাজল দিঘী। এই কাজল দিঘীতে লাল কমল ফুটে রয়েছে। হ্যাঁ, এই লাল কমলই আমর বন্ধু রাখাল চেয়েছে! তারপর, হীরামনের দ্বীপ-সাগরে জল। হ্যাঁ, ওতেই সে ভাল হয়ে উঠবে।—ধীরে ধীরে অঞ্জনকুমার অচিনপুরীতে এসে হাজির হয়। অঞ্জনকুমার শিউরে ওঠে। আপন মনে বলে : উঃ! কি ভীষণ অন্ধকার—এই প্রাসাদ! প্রাসাদের দু'য়ারে ঘা মারে, ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে ওঠে। সহসা রুদ্ধ প্রাসাদের ভিতরের অর্গল যায় খুলে নিঝুম, নিস্তব্ধ এই পুরী যেন ঘুমিয়ে রয়েছে।

এমনি সময়ে এক সঙ্গে অনেকগুলো রাক্ষসের হাঁউ মাঁউ খাউ-এর চিৎকারে নিস্তব্ধ অচিনপুরী মুখরিত হয়ে ওঠে। অঞ্জনকুমার ভয় পাবার ছেলে নয়। সে তীর ছোঁড়ে—দাঁড়া, তোদের একে একে যমের বাড়ী পাঠাচ্ছি! এদিকে কিন্তু রাক্ষসীদের চীৎকার-ধ্বনিতে সারা প্রাসাদেই যে মুখরিত হয়ে ওঠে তা নয়, তাদেব কর্ণভেদী চীৎকারে সারা আকাশ ছেয়ে যায়! এদিকে দেখতে দেখতে অঞ্জনকুমারের তীরও ফুরিয়ে আসে। তাই তো—এখন উপায়? সে এখন কি করবে? কিছুই ঠিক করতে পারে না। সহসা তার মনে পড়ে,—হ্যাঁ রাখাল আমাকে যে বাঁশী দিয়েছিল···বাঁশীতে ফুঁ-দিতেই রাক্ষসীদের আর্তনাদ, চীৎকার-ধ্বনি ধীরে ধীরে নীরব হয়ে আসতে থাকে। সত্যিই দেখতে দেখতে রাক্ষসীগুলো একে একে ঘুমের রাজ্যে ঢলে পড়ে। অঞ্জনকুমার এক মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারেনি—বাঁশীর এত গুণ!

এবার অঞ্জনকুমার ধীরে ধীরে প্রাসাদের অন্দরমহলে প্রবেশ করে ঐ যে পাথরের ঘরখানা—হ্যাঁ, ঐ ঘরেই বন্দিনী হয়ে আছে কুঁচবরণ কন্যা। শ্বেত পাথরের দরজাও অঞ্জন খুলে ফেলে। ঐ যে পালঙ্ক—ঐ পালঙ্কেই কাজল গাঁয়ের বন্দিনী কুঁচবরণ কন্যা ঘুমিয়ে আছে। ওই রাক্ষসীগুলোই একদিন কুঁচবরণ কন্যাকে ভুলিয়ে এনে এখানে বন্দী করে রাখে। অঞ্জনকুমার পালঙ্কের আরও কাছে এগিয়ে যায়···গিয়ে দেখে—কুঁচবরণ কন্যার শিয়রের কাছে সোনার কাঠি আর পায়ের দিকে রূপোর কাঠি।

অঞ্জনকুমার সোনার কাঠি রূপোর কাঠির গল্প মায়ের কাছে অনেকদিন শুনেছে। সে তখন সোনার কাঠিটি তুলে কুঁচবরণ কন্যার পায়ের দিকে যায়, আর রূপোর কাঠিটাও পায়েব কাছ তেকে তুলে শিয়রের দিকে নিয়ে যায়।

বাঃ, কি আশ্চর্য রহস্য!

কুঁচবরণ কন্যা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠছে মনে হয়। নিজের দুটি হাত দিয়ে চোখ দুটি রগড়ে নেয় সে। আপন মনেই কুঁচবরণ কন্যা বলে ওঠে—'কে?'

প্রথমে অঞ্জনকুমার কোন কথা বলে না। নিজের ডান হাতের একটি তর্জনী তুলে চোখের ইশারায় কুঁচবরণ কন্যাকে বলে, 'চু-প! কুঁচুবরণ কন্যে।'

কুঁচবরণ কন্যা বিস্মিত হয়! প্রশ্ন করে, 'তুমি কে?'

'আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। ওরা তোমাকে চুরি করে নিয়ে এসেছে। তাই তো তোমাকে উদ্ধার করতে এই অচিনপুরীর দেশে এসেছি।' অঞ্জনকুমার নির্ভীক বীরের মত কথাগুলো বলে। বলে, 'আমার নাম অঞ্জনকুমার।'

কুঁচবরণ কন্যা চমকে ওঠে। বলে, 'কুমার শীঘ্র এখান থেকে পালিয়ে যাও। রাক্ষসীরা এখনি তোমাকে'—

অঞ্জনকুমার কুঁচবরণ কন্যাকে আর কিছু বলতে দেয় না। শুধু

বলে, 'আমি তাদের সাতদিন, সাতরাত ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই,...আর দেরি করো না...উঠে পড়ে।'

কুঁচবরণ কন্যা বলে ওঠে, 'কোথায় যাবো?'

কোথায় আবার যাবে? তোমার দেশে যাবে...তোমার মা-বাবার কাছে।'

'হ্যাঁ কুমার, আমি আমার মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছে যাবো।'—

'হ্যাঁ চলো, এই অচিনপুরীর পাষাণ-কক্ষ থেকে পালিয়ে যাই। রাখাল, হীরামন, ওরা যে সবাই আমার আশায় বসে আছে।'

'ওরা কারা?'

অঞ্জন তার বাঁশীটি বের করে দেখায় আর বলে, 'এ বাঁশীটি আমার রাখাল বন্ধু আমাকে দিয়েছে। সে আমার সব চেয়ে বড় মিতা, বড় বন্ধু। আর এই যে ফল দেখছো'—এ বলে ঐ ফল একটু ভেঙে নিজে খায়, খানিকটা কুঁচবরণ কন্যাকে খেতে দেয়। খেতে খেতে আবার বলে, 'একটু ফল খেলে খিদে-তেষ্টা আর কিছু থাকবে না। এরপর রাখাল বন্ধুর জন্যে লাল কমল তুলতে হবে। আর হীরমনের জন্যে সাগরের জল নিতে হবে।'—

এ বলে অঞ্জনকুমার, ও কুঁচবরণ কন্যা উঠে দাঁড়ায়।

কুচবরণ কন্যার আবার সেই একই প্রশ্ন—'কেন, ও দিয়ে ওরা কি করবে?'—

অঞ্জনকুমার বলে, 'পথে যেতে যেতে তোমাকে সব বলবো। চল, যাবে না তোমার দেশে?'

'উঃ, আজ কত দিন হবে, মনেও করতে পারছি নে, আমি... আমার মা-বাবাকে কতদিন দেখিনি! কুমার, এই পাথরের ঘরের বাঁ-দিকে একটা পথ আছে, পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়। এ পথের সন্ধান আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

অঞ্জনকুমার বলে, 'চলো কুঁচবরণ কন্যা! এই যে আমি বাঁশী বাজাচ্ছি। এ বাঁশীর সুর শুনে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে—কেউ আর

আমাদের পথ রুখতে পারবে না।' এ বলে অঞ্জনকুমার বাঁশীতে ফুঁ দেয়। ধীরে ধীরে বাঁশীর সুর সারা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

অঞ্জনকুমার আর রাজকন্যে মুক্তির আনন্দে যেন উপছে পড়ে।

এক রাজার গল্প

অনেক কাল আগেকার কথা।

তখনকার দিনের রাজা ছিলেন পরোপকারী ও ধার্মিক। প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দেখলে, রাজা তা দূর করতেন।

একদিন সংবাদ এল, এ রাজ্যের দিকে প্লেগের কবলে হাজার হাজার লোক মারা যাবে।

প্লেগের আগমন সংবাদে রাজা খুব ভীত হলেন। রাজা তখনি পুরুতদের ডেকে পাঠালেন। রাজা ভাবছেন প্লেগের অভিযানকে গতিরোধ করার কথা। পুরুতরা এলেন রাজ দরবারে। রাজা তাঁদের প্লেগের আগমনের সংবাদ দিলেন। প্লেগ তারই রাজ্যের দিকে এগিয়ে আসছে। পুরুতদের কাছে রাজা পরামর্শ চাইলেন কি উপায়ে প্লেগ মহামারীর কবল থেকে রাজ্যের প্রজাদের বাঁচাতে পারেন।

পুরুতরা নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান পুরোহিত যিনি, তিনি রাজাকে বললেন, "বদ মেজাজী প্লেগকে উপঢৌকন দিয়ে শান্ত করতে হবে। তাকে রাগিয়ে দিলে সে রেগে আমাদের ক্ষতি করবে।

রাজা সমাজের পুরোহিতদের বিধান মেনে নিলেন। তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন প্লেগ-মহামারীর তুষ্টির জন্যে পূজো করতে এ কাজে যা ব্যয় হবে, রাজতহবিল থেকেই হবে।

কয়েকদিন পরই পুরুতরা কাজ শুরু করেন। প্রতিদিন মাঝরাতে

রুদ্র দেবতা দর্শন দেন। তিনি প্রধান পুরোহিতকে জিগ্যেস করেন, 'তুমি কি চাও? আমাকে কেন ডেকেছো?'

পুরুত ত ভয়ে জড়সড়। মাথা নুয়ে রুদ্রদেবতাকে প্রণাম জানায়। আমতা আমতা করে সে বললে, 'হে রুদ্রদেবতা! আমাদের সব কথা তোমাদের জানা; আমরা তোমার কাছে কি প্রার্থনা করছি, তাও তোমার অজানা নয়, প্লেগ আমাদের রাজ্যের দিকে আসছে; তার হাত থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।'

রুদ্রদেবতা বললেন, 'তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হ'ক। আমার রক্ষীকে তোমাদের দেশের পাহারায় নিযুক্ত রাখছি। যে অপদেবতাই আসুক না কেন, নন্দী তাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে।' —এই বলে রুদ্রদেব অদৃশ্য হলেন। তার পরের দিন এই শুভ সংবাদ পুরুতেরা রাজাকে জানালেন। রাজা এই সংবাদে ভারী খুশী হলেন। আর প্রত্যেক পুরুতকে পঁচিশটা গাভী ও নগদ পঞ্চাশ কাহন কড়ি পুরস্কার দিলেন। প্রত্যেকই হাসি-খুশী হয়ে বাড়ী গেলেন।

নন্দী রাজ্যের সীমান্তে দিন-রাত পাহারা দিয়ে চলে। সব সময়ই নজর রেখেছে প্লেগে পথের দিকে যেন সে রাজ্যে না ঢুকতে পারে।

একদিন রাত্রিবেলায় নন্দী যখন একা পাহারায় ছিল, এমন সময় করাল দর্শন প্লেগ এসে হাজির হ'ল। সে রাজ্যে ঢুকবার জন্য দাবী করল। নন্দী তাকে বাধা দিলে। খাপ থেকে তরবারি বের করে নন্দী হুঙ্কার দিয়ে বললে, "সাবধান, এক পা এগিয়ে এলেই যমের বাড়ী যেতে হবে। বাঁচতে চাও তো, ফিরে যাও—"সেই ভয়ংকর প্লেগও সহজে যাবার নয়। কাজেই দুজনের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ বাধল। অনেক ক্ষণ ধরে তাদের লড়াই চলে। এর ফলে পাহাড় ভাঙচুর হল। গাছ উপড়ে পড়ল। যাক' শেষ পর্যন্ত দু'জনেই একটা শর্তে এল। দু'জনের মধ্যে এই চুক্তি হল যে, শুধু একটি দিনের জন্য প্লেগ রাজ ধানীতে থাকবে আর শুধু সে একজনেরই প্রাণ সংহার করে ফিরে আসবে।

তার পরদিন সন্ধ্যার সময় সারা শহরে কান্নার ধুম পড়ে গেল।

জানা গেল, শহরে একশ'জন লোক প্লেগে মারা গিয়েছে। রাজা তখনই পুরুতদের ডেকে পাঠালেন। আর তিনি তাঁদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করলেন,—কেন তাঁর রাজ্যে এ অঘটন ঘটল ?

পুরুতেরা এই ব্যাপারে রাজাকে কি আর জবাব দেবেন ? তাঁরা তখনই রুদ্রদেবতার অনুচর নন্দীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন আর এই ধরণের ঘটনা কেন তাদের ঘটল, তা জানতে চাইলেন।

নন্দী এদিকে রেগে অগ্নিশর্মা হয়েছে। পুরুতদের কোন অভিযোগ শুনবার মত বা কিছু বলবার মত তার সময় ছিল না। প্লেগকে ধরবার জন্য নন্দী খুঁজে বেড়াচ্ছে। শীগগিরই নন্দী একটি দূষিত হওয়ার ঘরের ধূলিময় মেঝেতে প্লেগের দেখা পায়। আর কি ! নন্দী প্লেগের ঘাড়টি ধরে গম্ভীর গলায় বলল, "ওরে শয়তান, তুই তোর শপথ রাখতে পারিসনি ; কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেছিস। তুই একজনার প্রাণ সংহার না করে একশো লোকের প্রাণ হরণ করেছিস। তোর কথা ও কাজে কত তফাৎ। তোকে তার জন্য উপযুক্ত সাজা পেতে হবে।—"

নন্দীর এ কথা শুনে প্লেগ হেসে উঠল আর বলল, "ভাই আমার উপর রাগ কর না। আমি আমার কথা কখনও খেলাপ করিনি। আমার কথামত শুধু একজনার প্রাণ হরণ করেছি। কিন্তু বাকী নিরানব্বই জন ভয়ে ও আতঙ্কে মারা গিয়েছে। তাদের শুধু সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল আর সাধারণ একটু গলা ফুলেছিল ; আমার আগমনে তারা মনে করল, তাদেরকেও আমি ধরেছি। তাদের আমি ধরেছি এই ধরণের অহেতুক ধারণায় মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়, এ ভয় থেকেই তাদের মরন হ'ল।"

এ বিষয় নিয়ে আর কিছু বলবার নেই। নন্দী তাকে ছেড়ে দিল। পুরুতেরা এই সংবাদ রাজাকে জানিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

চম্পকনগরের রাজসভা

চম্পকনগরের রাজার রাজসভার পণ্ডিত বাঞ্ছারাম শর্মা।

শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছারামেরই জয় জয়কার !

মাত্র দু'দিন বাকী। এ দুটো দিন অতীত হলেই বাঞ্ছারাম তর্কচুড়ামণি উপাধিতে ভূষিত হবেন। আর নগদ সম্মানী প্রণামীও পাবেন এক হাজার এক টাকা।

সত্যি, একথা কে ভাবতে পেরেছিল ? এতো বড়ো তর্কবাগীশ অক্রূরচন্দ্র। যাঁর নাম সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। অক্রূরচন্দ্র ফারাক্কা রাজ্যের বড় পণ্ডিত। পণ্ডিত বাঞ্ছারামের কাছে পরাজিত হলেন ফারাক্কা রাজ্যের পণ্ডিত।

চম্পকনগরের রাজাই ব্যবস্থাপনা করেছিলেন—তর্কযুদ্ধের। তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর রাজসভায় তর্কযুদ্ধের আসর বসবে। সব রাজ্যের পণ্ডিতরা যোগদান করতে পারবেন। যিনি জয়ী হবেন, মহারাজা তাঁকে নগদ দক্ষিণা ও উপাধি দানে সম্মানিত করবেন।

অনেক দেশের অনেক পণ্ডিত এলেন। তাঁরা অনেকেই নামী গুণী বড় বড় খেতাবধারী ছিলেন। পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন তারা। এমন কি পুরোনো শাস্ত্র অনেকেরই কণ্ঠস্থ, ঠোঁটস্থ ছিল। তাঁদের অনেকের স্বরচিত গ্রন্থও ছিল।

ভাগ্যদোষই বলতে হবে। নইলে এ হেন বাঞ্ছারামের কাছে পরাজিত।

এর চেয়ে আর দুঃখের কথা কিই বা হতে পারে ?

যাক্‌গে, সে সব কথা।

রাজার নাম, যশ, প্রতিপত্তি যা কিছু সবই নির্ভর করে রাজ্যের পণ্ডিত, কবি, বিদ্বানের কৃতিত্বের উপর। কথায় বলে কবির গৌরবে,

রাজার গৌরব। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্ন ছিলেন বলেই বিক্রমাদিত্যের এত নাম ধাম। একথা বলা চলে, কবি কালিদাসই ছিলেন উজ্জয়িনীর যা কিছু। নইলে রাজাকে কে আর অতো চিনতো বা জানতো? তেমনি চম্পকনগরের রাজার গৌরব পণ্ডিত বাঞ্ছারামের।

একথা তো আর মিথ্যে নয়; বাঞ্ছারামের উপরই চম্পক রাজ্যের যা-কিছু মান মর্যাদা।

আর মাত্র দু'দিন বাকী। এ দু'টো দিন অতীত হলেই রাজ-পণ্ডিত বাঞ্ছারামের জয় জয়কার। 'তর্ক-চূড়ামণি' শুধু চম্পকরাজ্যে নয়—সারা দেশ-বিদেশ জুড়েই পণ্ডিতের নাম ছড়িয়ে যাবে। অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলেই তিনি প্রমাণিত হবেন। তারই বিজয়োল্লাসে চম্পকরাজ্যের রাজধানী উল্লসিত হবে দু'দিন পরে।

এখন থেকেই কার্যসূচীর খসড়া সুরু হয়েছে। বাজী পোড়ান হবে, আতসবাজী ছোড়া হবে। আতসের ফুলকি, রোসনাই বাজি চম্পকনগরের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাবে।

বাঞ্ছারামের চোখেও ঘুম নেই। তাঁর মনের মধ্যে কত কিছু ভীড় করে আসে। দেখতে দেখতে একটা দিন চলে গেলো। আর বাকী শুধু একটা দিন। চব্বিশ ঘণ্টা।

একে একে যাঁরা এসেছিলেন বড়মুখ করে, তাঁরা ফিরে গেলেন কালো মুখ করে যে যাঁর রাজ্যে। এমন কি মিলনগড়ের ন্যায়রত্ন, বাচস্পতি। কপালে তিলক কেটে, গায়ে নামাবলী দিয়ে, হাত পা নেড়ে চেড়ে কত কত ভঙ্গীই না করলেন। সবাই মনেও করেছিলেন বাচস্পতিরই জয় হবে। কিন্তু বাঞ্ছারামেরই জয় হলো।

পরের ঘটনা। মহারাজা এসেছেন রাজসভায়। মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করছেন রাজার শাসন-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। পণ্ডিত বাঞ্ছারামকে কিভাবে সম্মানিত করা যায়, তাও আলোচনার বিষয় ছিল। এক রকম সব প্রস্তুতিই ঠিক হয়ে গেলো।

মহারাজা উঠি উঠি বলেও উঠতে পারছেন না। রাজসভা ভেঙে আসার সময় হয়ে এলো প্রায়। মহারাজার মন্ত্রী ব্যতীত সবাই বিদায় নিলেন।

রাজসভায় ঠিক এমন সময়ে এক পত্রবাহক এলেন।

রাজা পত্রখানি খুলে পড়লেন, গণ্ডগ্রাম থেকে চিঠিখানা এসেছে। লিখেছেন দিগ্‌গজ পণ্ডিত দিগম্বর। আমি গণ্ডগ্রাম হইতে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছি। আমি আপনার বিজয়ী পণ্ডিত বা বাঞ্ছারামের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অভিযোগ করি।—

মহারাজ চিঠিখানি পড়ে বললে 'তথাস্তু'।

চারদিক সংবাদ প্রচারিত হলো—দিক্‌বিজয়ী পণ্ডিত আসছেন দিগম্বর।

এর মধ্যে দিগম্বর এসে হাজির হলেন। মহারাজ যথারীতিভাবে অভ্যর্থনা করে রাজসভায় তাঁকে বসালেন।

দিগম্বর পণ্ডিত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তাঁর কোন চাকচিক্য নেই, সম্পূর্ণ এক গেঁয়ো লোক, পায়ে জুতোও নেই।

মহারাজ পণ্ডিত দিগম্বরকে দেখে একটু অবাক হলেন। কি আশ্চর্য—এতদূর পথ পায়ে হেঁটে তাও নগ্নপদে এসেছেন দিগম্বর! সহজ কথা নয়। চোখে মুখে কোন কিছুরই ছাপ নেই যাতে দিগম্বরকে বুঝায় একজন তার্কিক পণ্ডিত।

মহারাজ বললেন, আপনার বিশ্রামকক্ষে গিয়ে বিশ্রাম করুন। দিগম্বর পণ্ডিত দণ্ডায়মান হয়ে হাত জোড় করে আবেদন জানালেন, মহারাজ আমার সঙ্গে দশগাড়ি বোঝাই পুঁথিপত্তর আছে। এ সব পুঁথি খুব সযত্নে নিয়ে আসছে গরুর গাড়ীতে। পুস্তকগুলি রাখবার জন্য একটা বাগান বাড়ী হলে ভাল হয়। আমি ওখানেই থাকব'খন।

মহারাজ ত এ কথা শুনে 'থ' হলেন। যাক্ মহারাজ আর ভাবতে পারলেন না। দিগম্বরের ইচ্ছানুযায়ীই একটা বাগানবাড়ী দেওয়া হলো—। তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।

দিগম্বর পণ্ডিত দ্বিতীয় আবেদন জানালেন, মহারাজ কয়েকজন পাইক দেবেন। আমার গাড়ী বোঝাই পুঁথিপত্তরগুলি চৌকি দেওয়ার জন্য।

'তথাস্তু'—মহারাজ এই বলে তখনি কয়েকজন পাইক সেখানে নিযুক্ত করলেন।

এ সংবাদও সারা রাজ্যে প্রচার হয়ে পড়ল।

সবাই উৎসুক হয়ে দেখতে এলো। দূর থেকে দর্শকরা গাড়ীগুলি দেখে আর গাড়ীর বাহকদের দেখে। ধারে কাছে কেউ যেতেও পারে না, সবার মুখে একই কথা—এ যে-সে তর্করত্ন নয়, দেখনা গাড়ী বোঝাই বিদ্যা...এবার বাঞ্ছারাম বুঝবে'খন।—

কথা কানাকানি হয়ে বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শেষকালে বাঞ্ছারামের কানেও গেলো—এ সংবাদ।

মহারাজ ডেকে পাঠালেন বাঞ্ছারামকে। বাঞ্ছারাম এলেন। মহারাজ বললেন, এবার গণ্ডগ্রাম থেকে দিগম্বর পণ্ডিত এসেছেন। আগামীকাল এক যুদ্ধ শুরু হবে। কাজেই যা-কিছু আয়োজন করেছিলাম, তা এখন বন্ধ রাখা হলো। দেখুন, নামকরা পণ্ডিতদের ত পরাজিত করেছেন—

বাঞ্ছারাম মুখে হাসি টেনে বললেন, মহারাজ কিছু ভাববেন না: গণ্ডগ্রামের যে পণ্ডিত-ই থাকুক না কেন। সে গণ্ডমূর্খ জানবেন। —এই বলে বাঞ্ছারাম মহারাজকে আশ্বাস দিলেন।

মাঝরাতের কথা।

বাঞ্ছারাম আকাশ পাতাল ভাবছেন। শুধু একটা দিন বাকী ছিল। কোথাকার কে দিগম্বর এসে হাজির হলো। ঘুম কিছুতেই তাঁর চোখে আসে না। ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে তাঁর ভীড় করে আসে গাড়ী বোঝাই পুঁথি পত্তর। তিনি উঠে পড়েন বিছানা থেকে এক পা দু'পা করে বাড়ান আবার এক পা পিছিয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছারামও এক রকম গা-ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন—ঐ ত

বাগান বাড়ী…পাইক চৌকি দিচ্ছে—হাঁ, ভুল—ভুল নয়…এক, দুই করে গোনেন…হ্যাঁ, ঠিক দশখানাগাড়িই ত…বেশ মোটা দড়ি দিয়ে খুব কষে তাঁবু ঢাকা দিয়ে বাঁধা। যাকগে আবার বাঞ্ছারাম ঘরে ফিরে আসেন। ঘুম টুম কিছুতে আর আসে না। ঘুর ফির করে মনের মধ্যে বাঞ্ছারামের ঐ গাড়িগুলিই ঠেলাঠেলি করে! বাকী রাত তাঁর এমনি করে কাটলো।

কখন যে ভোর হয়ে যায়। বাঞ্ছারাম জানতেও পারেন না।

রাজসভা।

যথা সময়ে রাজসভা বসলো। রাজসভায় শুধু লোক আর লোক। সবাই উৎসুক, উৎকীর্ণ, উৎকণ্ঠিত।

দিগম্বর পণ্ডিত এলেন। দিগম্বরের কোন চাল চলন নেই, অতি সাধারণ, সাদাসিধে।

দুরু দুরু বক্ষ, কণ্ঠস্বর নিষ্প্রভ। থর্ থর্ কম্পমান দেহ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন পণ্ডিত বাঞ্ছারাম।

কি আশ্চর্য! বাঞ্ছারাম কোন কথাই বলতে পারলেন না! শুধু বললেন, যাঁর দশগাড়ি বোঝাই পুঁথি-পত্তর সেই পণ্ডিত দিগম্বরের কাছে আমার গৌরব ম্লান। আজ আমি পরাজিত!

এ ধরনের ঘটনা ঘটবে, তা কেউ ভাবতেও পারেননি।

দিগম্বরের জয় জয়কার।

দিগম্বরকে কোন কথাই আর বলতে হলো না। শুধু তিনি রাজসভায় দাঁড়িয়েছিলেন বাঞ্ছারামের সম্মুখে—ঐ যা!

শেষ কথা!

চম্পকরাজ্যের রাজা দিগম্বরকে তর্কচূড়ামণি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন। আর সেই সঙ্গে নগদ এক-হাজার একটাকা প্রণামীও দিলেন।

দিগম্বরকে একটি কথাও বলতে হয় নি। যথাকালে দিগম্বর তর্কচূড়ামণি উপাধিতে ভূষিত হয়ে চম্পকরাজ্য থেকে বিদায় নিলেন।

তাঁর দশখানা পুঁথি-পত্তরের গাড়ির মধ্যে গাড়ি থেকে একখানাও বই আনতে হয় নি। যেমনি বাঁধা ছিল, ঠিক তেমনি বাঁধা থাকলো পুঁথি-পত্তরের গাড়ি।

দিগম্বর গণ্ডগ্রামে ফিরে চললেন সঙ্গে তাঁর গাড়িগুলি নিয়ে।

দিগম্বর নিরক্ষর। শুধু বুদ্ধির জোরেই সে সেদিন চম্পক রাজ্যের পণ্ডিত বাঞ্ছারামকে পরাজিত করেছিল।

পুঁথি-পত্তর কিছুই ছিল না; ছিল শুধু দশ গাড়ি-বোঝাই ইট।

রাজার কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিল, সেই টাকা থেকে কিছু টাকা দিয়েছি, যে তাকে রাজার কাছে চিঠিখানা লিখে দিয়েছিলো।

দিগম্বর ধার্মিক ছিল।

বিধু ভট্টাচার্যের পাঠশালা

পুরোনো দিনের লুপ্ত কাহিনী। আজকের দিনে অনেকেই সে-কথা ভুলে গেছেন। গ্রামের যেখানটায় আগে পাঠশালা ছিল, আজ সেখানে নতুন ইমারত গড়ে উঠেছে।

পাঠশালার সামনে সরষে ক্ষেত ছিল। সরষে ফুলগুলি যখন হলুদমাখা রঙ নিয়ে ফুটে উঠতো, তখন নানা রঙের পোকা ফুলের চারদিকে ঘুরে বেড়াতো। কখনো বা একটা ভুর ভুর গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসতো।

আজ সে সরষে ক্ষেতও নেই, তেমনি ক'রে ফুলও ফুটে না। মধুর লোভে মৌমাছিরাও আর আসে না। সে ক্ষেত আজ ছেলেদের খেলার মাঠ হয়েছে।

পাটশালার পণ্ডিত ছিলেন বিধু ভট্টাচার্য। পাঁচ বছর বয়স হলেই ছেলেদের হাতে খড়ি হতো। এরমধ্যে শুভঙ্করের আর্যা মুখস্ত ক'রে

ফেলতো। এমন কি, পূর্বপুরুষের, পিতৃ ও মাতৃকুলের নামও মনে রাখতে হতো। সুর ক'রে ক'রে সকলে চাণক্যের লোক বলতো,—"বিদ্বান সর্বত্র পূজতে।"

ভুল পড়লেই পণ্ডিত-মশাই চীৎকার ক'রে উঠতেন—ওটা 'পূজতে নয়, পূজ্যতে।'

ভয়ে ভয়ে ছাত্রটি উত্তর দেয় পণ্ডিত-মশাই আমার বইতে দেখুন পূজতে লেখা রয়েছে।

ও, দেখি দেখি। হ্যাঁ, তাই আছে বটে তবে ওটা ছাপার ভুল, বুঝলি ?

মাথা নেড়ে ছেলেটি বলে হ্যাঁ, পণ্ডিত-মশাই।

পাঠশালায় বসবার আসন ছিল ছেঁড়া-মাদুর। ছেঁড়া-মাদুরে বসে ছেলেরা অ, আ, ক, খ লিখতো তালপাতায়। তালপাতা বাজারে কিনতে পাওয়া যেত না। গাছ থেকে কেটে আনা হতো তালপাতা। এই ছিল তখনকার পাঠাশালারছেলেদের লেখবার কাগজ। তখনকার পুঁথি-পত্তর সবই তালপাতায় লেখা হয়েছে। এমন কি, দলিল-পত্রও ঐ তালপাতাতেই লেখা হতো। আজও সে সব কিছু কিছু সযত্নে 'মিউজিয়ামে' তোলা আছে।

তখনকার দিনে দোয়াত ছিল মাটির আর কলম ছিল খাগের। কালি ছিল 'কষ-কালি'। ঐ কষ-কালি দিয়েই যা কিছু লেখা হতো। এ কষ-কালি আবার বাজারে পাওয়া যেত না। কাজেই বাড়ীতেই তৈরী ক'রে নেওয়া হতো। তাছাড়া, আরেক রকমের কালি ছিল ভুষো-কালি। এ কালিও বাড়ীতেই তৈরী করা হতো। এই দুই কালি দিয়েই ছেলেরা লিখতো তালপাতায়। তখনকার দিনে সরকারী দলিল-পত্রও এই কালিতেই লেখা হতো।

পাঠশালার ছেলেরা কেউবা খড়ি দিয়ে মোটা মোটা হরফে 'ক' 'খ' লেখার পর দাগ বুলাতো। আবার কেউ বা সুর করে তালপাতায় লিখতো কড়ির মতো 'ক', মাথায় পাগড়ী 'ঙ', ছেলে কঁকৃখে 'ঝ',

পিঠে বোচকা 'ঞ', হাঁটুভাঙা কান মোচড়ানো 'ধ', হাতপাখা 'প', পেট কাটা 'ষ,' প্রভৃতি।

তারপর সুর ক'রে ক'রে সমবেতা কণ্ঠে ধারাপাতের কড়া-গণ্ডা পাঠ শুরু হলো। কড়া-গণ্ডা পড়বার সময় সকলে সারি ক'রে দাঁড়াতো। প্রথমে একজন দলপতি থাকতে। সে বলতে থাকে—'এক কড়া পোয়া গণ্ডা'।

দলের সবাই সমস্বরে হাঁকতো—"এক কড়া পোয়া গণ্ডা" এভাবে কড়া-গণ্ডা, শতকিয়া, নামতা আবৃত্তি করতো।

পাঠশালা বলতে গেলে সব সময়ই খোলা থাকতো। পণ্ডিত মশাই পাঠশালাতেই বেশি সময় থাকতেন।

যদি কোনদিন পণ্ডিত মাশায়ের কোন বাড়ীতে নেমন্তন্ন থাকতো, তবে সেদিন পাঠশালার 'হাফ-ডে' হতো।

পাঠশালার ছুটির পর পণ্ডিত মশায়ের অনেক কাজ অনেক ছেলেকেই করে দিতে হতো। তবে যারা পণ্ডিত মশায়ের বেশি অনুরক্ত ভক্ত তারাই এই কাজ করবার সুযোগ পেতো। ছাত্রের পণ্ডিত মশায়ের কাজ ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করতো। হুঁকোতে জল ভরা, তামাক দেওয়া, তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করা, আবার পণ্ডিত মশায়ের মাথার পাকা চুলও তুলে দিত। কারো যদি কোন কাজে একটু ভুলচুক হতো, তাহলে পণ্ডিত মশায়ের করুণা থেকে কেউই অব্যাহতি পেতো না। তিনি কাউকে এক পা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে বলতেন, আবার কাউকে বা বার হাত মেপে নাকে খত দিতে হতো। আবার অনেক নিজের বাঁ হাতে নিজেই কান মলা খেতো।

শান্তমতি ছেলেরা তখন নীরবে এই শাস্তি গ্রহণ করতো। শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদের কথাই তারা ভাবতে পারতো না। তখনকার অভিভাবকরাও ছিলেন শিক্ষক ও গুরুমশাইদের উপরে নিভরশীল। তাই কোন, বিদ্যালয়েই কখনো কোন অশান্তির সৃষ্টি হতো না।

আর আজ? যাক সে কথা।

পাঠশালা ছুটি হয়ে যেতো। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে আসতো। পাঠশালার অনতিদূরে ঝোপ-জঙ্গল। সেখান থেকে শিয়ালের ডাক শোনা যেতো। পুকুরপাড়ে একটা গাবগাছ ছিল। ঐ গাবগাছটা দেখিয়ে অনেক দিন পণ্ডিত মশায় বলতেন—"ঐ গাছে একটা ভূত আছে। ভূত রাতের বেলায় বেরিয়ে আসে। যারা নোংরা, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন থাকে, তাদেরই ভূতে ধরে।"

ভূতের ভয়ে ঐ পথ দিয়ে রাত্রিতে অনেকেই যেতো না।

বাড়ীর ছোট ছোট শিশুরা কাঁদলে, তখন ঐ গাবগাছের ভূতের কথা বলে শিশুকে ভয় দেখানো হ'তো। মা বলতেন—"ঐ যে ভূত বুড়ো আসছে ঝোলা কাঁধে, নে চুপ কর, নইলে ঐ ঝোলায় ক'রে নিয়ে যাবে তোকে।"

শিশু তখন সত্যি-সত্যিই কান্না ভুলে মায়ের গলা আঁকড়ে ধরে থাকতো। আবার কখনো বা মাও শিশুকে আঁচলে জড়িয়ে বুকে ধরে রাখতেন।

আজ বিধু ভট্টাচার্যের সেই পাঠশালা আর নেই। সেখানে সরকারী পল্লী উন্নয়ন দপ্তর খানা ভবন উঠেছে। পল্লীর পথ-ঘাট সংস্কার হচ্ছে। পল্লীর নিরক্ষর বয়স্করা যাতে লেখা-পড়া শিখতে পারে, তারই গবেষণা চলছে আজ এই পল্লী কেন্দ্রে। সবাই আজ ব্যতিব্যস্ত, কর্মমুখর। শহর থেকে বাবুরা এসেছেন। এসেছেন গ্রাম-সেবকরা, আবার গ্রামসেবিকারাও এসেছেন। তাঁরা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে তদারক করছেন। রাত্রিতেও দেখা যায়, পল্লী উন্নয়ন দপ্তরে আলো জ্বলছে; রচনা করছেন পাঁচশালার কাজ রূপায়ণের, আদর্শ পল্লীর কর্মতালিকা গড়ে উঠছে।

কিন্তু আজও যখন ঐ পথ দিয়ে হাঁটি তখন যেন শুনতে পাই, বিধু ভট্টার্যের পাঠশালায় ছেলেদের কণ্ঠস্বর। সমস্বরে তাদের ত্রীপদী ছন্দে গঙ্গা-বন্দনা করার গান ভেসে আসে:

"বন্দমাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি
পতিত পাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উপাদান দ্রবময়ী তব নাম
সুরাসুর নরের জননী।"

তারপর অদূরে লোহা-লক্কড়ের শব্দে ভেসে যায় গঙ্গা-বন্দনা।

ঐ যে নয়া সড়ক সবে গড়ে উঠেছে, ঐ পথ দিয়ে এখন হাঁটি। পিছনে পড়ে থাকে বিধু ভট্টাচার্যের পাঠশালা···চলতে চলতে ভাবি, ঘটনার আবর্তে পড়েই হয়ত এমনি ক'রে ভাঙে আর গড়ে। এমনি ক'রেই হয়ত কাহিনীর পর কাহিনী গড়ে ওঠে।

ঘুমের রাজ্যে জীবজন্তু

দিনের বেলায় আমরা কাজ করি। সারাদিনের কাজে আমরা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি। রাতে আমরা সবাই ঘুমের রাজ্যে চলে পড়ি। আমাদের আশেপাশে রয়েছে বিড়াল, কুকুর, গরু, ঘোড়া, আরও কত রকম কীটপতঙ্গ ও নানা ধরনের পাখী। তাদের কথা কি কখনো ভেবেছো? ওরা কি ঘুমোয়। হাঁ, ওরাও ঘুমোয়। কিন্তু তোমার আমার মতো ঘুমোয় না।

বেশ, সবার আগে আমাদের বাড়ীর পোষা মেনীর কথাই বলছি। মেনীকে দেখবে, উনুনের ধারে, বিছানার ধারে কাছে। মেনী চায় সুখ আরাম। তাই ওকে আরাম প্রিয় প্রাণী বলা যায়। মেনা কখনও হাত পা ছড়িয়ে আমাদের মত ঘুমোয় না। হাত পা বাঁকিয়ে, কুঁকড়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে। বাড়ীর ভুলো কুকুরও মেনীর মতো ঘুমিয়ে থাকে ঘরের দাওয়ায়, উঠোনে, বা ঘরের পিছনে। ওরা ঘুমোলেও খুব সচেতন। একটু শব্দ হলেই ওরা জেগে ওঠে।

আমরা পিঠের ওপর ভর দিয়ে দিব্যি বিছানায় শুয়ে থাকি তাই নয়? কোন জীবজন্তুকে আমাদের মত পিঠে ভর দিয়ে শুতে দেখা যায় না। আমরা চোখ বুজে ঘুমোই। শুনলে ভারি অবাক হবে সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয় কিন্তু চোখ খুলে ঘুমোয়। ঘোড়া কিন্তু দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। অবার গরু হাত পা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয়। গরুর মতো ভেড়া, ছাগল, মোষ জাবর কাটে। তাদের মোটেই ভাল ঘুম হয় না। হাতিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। সে অবিশ্যি মাঝে মাঝে পা বদলে ঘুমোয়।

রামায়ণে রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের ঘুমের কথা শুনেছো ত? বছরে ছয় মাস কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়ে কাটাত। আবার তার ঘুম ভাঙার জন্য রীতিমত কাঁসর, ঘণ্টা বাজাতে হত, এমনি ধরনের ঘুম ছিল তার। কুম্ভকর্ণের মতই কোন কোন পশুপাখী সারা শীতকালটাই ঘুমোয়। একদল জীবজন্তু এ সময়টা লম্বা ঘুম দেয়। তিন চার মাস তারা নির্বিঘ্নে ঘুমোয়। যখন তাদের ঘুম ভাঙে, তখন তাদের শরীর খুব রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সহজই বুঝতে পার। তখন তাদের কি রকম খিদে পায়। সামনে যা পায় তাই ধরে খায়।

পণ্ডিতরা বলেন, এরা যখন অনেকদিন ধরে ঐভাবে ঘুমিয়ে থাকে, তখন ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস সাধারণভাবে চলাচল করে না। দেহের রক্তের চলাচল ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এ সঙ্গে দেহের তাপও কমে আসে। সমস্ত শরীর হিম হয়ে পড়ে। কিছু না খাওয়ার ফলে ওদের দেহের চর্বি যায় কমে। আবার দেখা গিয়েছে শীত অঞ্চলে একদল প্রাণী মোটেই ঘুমোয় না। এ থেকে বোঝা যায়, শীতই আসল কারণ নয়।

এবার যাদের কথা বলছি, যারা বেশীদিন ধরে ঘুমোয় না। ঘুমোনোর ধারাটাও অদ্ভুত। এক রকম পাখী আছে যারা তাদের ঠোঁটটা পালকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুমোয়। অনেক পাখী এক পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। বক পাখীও এক পায়ে খাড়া হয়েই ঘুমিয়ে থাকে।

চারদিকে বরফ ঝরছে। টাকী পাখি ঐ ঝড়ো বরফের মধ্যে গাছের ডালে নখ আটকে ঝড়ে দোলা খেতে খেতে ঘুমোয়। বাদুড়ও ঠিক টাকী পাখির মতো ঘুমোয়।

ক্ষুদে পিঁপড়ের কথা বলছি। হ্যাঁ ওরাও ঘুমোয় বৈকি। ওরা মাটির তলায় বেশ আরাম করে ঘুমোয়। ওরা মাটির তলায় যেখানটায় ঘুমোয়, তা দেখে মনে হবে, দিব্যি বিছানা পেতে ওরা ঠিক আমাদের মত মাথা থেকে পা সটান করে ছড়িয়ে দেয়, এমনভাবে ঝাড়া দিয়ে মুখ হাঁ করে খোলে যেন ওরা গভীর ঘুমের পর হাই তুলছে।

বনের পশু-পাখিরা সর্বদা সচেতন থাকে, তাই ওরা কোন রকমে ঘুমের কাজটা সেরে নেয়, ওরা একটু শব্দ পেলেই জেগে ওঠে।

এবার জলের প্রাণী মাছের কথা বলছি। আমারা দেখি মাছ দিনরাত জলে ঘুরে বেড়ায়। তবে কখন ওরা ঘুমোয়? এক ধরনের মাছ আছে, যারা ঘুমোতে জলের তলায় চলে যায়। আবার এক ধরণের মাছ আছে, যারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে। আবার অনেক সময় চলতে চলতেও ঘুমোয় ওরা।

ঘুমের রাজ্যের জীবজন্তুর কথা ভারী অদ্ভুত—নয় কি?

সত্যি! সত্যি!

ছোট মামা বদলী হয়ে এখানে নতুন এলেন।

বাড়ীর সবাই মামা মামীর সঙ্গে দেখা করতে গেলো। বেচারা মণ্টুকে কিন্তু সঙ্গে করে কেউ নিয়ে গেলো না।

আচ্ছা, মণ্টু কি দোষ করেছিল যে ওকে নিয়ে যেতে চাইলো না!

মা ত নিয়েই যেতে রাজী ছিলেন। এমনি পাশের ঘর থেকে মেজদি বলে উঠলেন: 'মা, মণ্টু থাক্! ওর আসছে-বুধবার পরীক্ষা।'

আর কি! মাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন: হ্যাঁরে—মণ্টু তোর ত পরীক্ষা! তোকে নিয়ে যাবো খন।

মণ্টু একা আর কি করে? সবাই ওর বিপক্ষে। বেচারা মুখ কালো করে চুপ করেই রইলো।

বাড়ীর সবাই ভাবলো মণ্টু ভাল ছেলে। কথা শুনে।

সত্যি সত্যি মণ্টুকে ফেলে ওরা চলে গেলো। এদিকে মণ্টুর যত রাগ হচ্ছিলো রানুদির উপর। ভারী ইয়ে একটু বড় হয়েছেন। পড়ে ত ভাঙা একটা স্কুলে। বিদ্যা যা হয়—হাঁ, কাঁচকলা। সেবার ত অংকে ফেল করেছিল। ভ্যাগ্যিস ওদের রমাদি টিচার ছিল, পাঁচ নম্বর দিয়েছিল বাড়িয়ে। তা নইলে—

আর আমার ত ভারী ক্লাস ফেরের পড়া। কবেই ত শেষ হয়ে গেছে ইংরেজীর সেই গল্পগুলো।

কি মেয়ের হিংসুকটি! নিজের বুঝি আর পড়া ছিল না?

মা শুধু ঐ মেজদিকেই ভালবাসেন।

এবার মণ্টুর যেন কান্না আসতে থাকে।

শেষটায় বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

এতো বড় বাড়ীতে মণ্টু আজ একা। বাবাও আজ বাড়ীতে নেই। মফঃস্বলে গিয়েছেন কি একটা কাজে।

ঐ যে কিসের যেন একটা শব্দ হয় খুট্ করে। চোখ মেলে মিট্ মিট্ করে।

দূর, ও কিছু নয়। পোষা বিড়ালটা খোলা জানালা দিয়ে মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে। ঐ বুঝি একটা মাকড়সাকে ধরার চেষ্টা করছে।

তাই ত—এখন যদি—তারপর মণ্টু আর মনে করতে পারছে না। সেদিনের ক্লাসের রাসু একটা বড় ভূতের গল্প বলেছিল। ভূতটা নাকি আবার সত্যিকার।

ঈয়া লম্বা লম্বা হাত পা। কথা বলে নাকি-সুরে! ভূতটা নাকি রোজই রাত্রিতে একবার স্কুলের বড় মাঠটার উপর দিয়ে যায় আর আসে।

যদি ঐ ভূতটা এখনি মণ্টুদের বাড়ীর ছাদে আসে—তবে…ঐ বুঝি পায়ের খট্‌খট্ শব্দ।

মণ্টু সাহস করে বলে—দূর, ও কিছু নয়। আসুক না ভূতটা! হুঁ, মজাটা দেখিয়ে দেবো। এক ঘুসিতে ওর ছুঁচলো নাকটা থ্যাবড়া করে দেবো।

মণ্টু রোজ বৈকালে 'এ্যাক্‌সারসাইজ' করে।

আবার তখনি বীর মণ্টুর বীরত্ব মিলিয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি গায়ের চাদরটা নাকে মুখে জড়িয়ে মুখ ফিরে শুয়ে থাকে।

ঘুম কিছুতেই আসে না। এখনো ওরা ফিরে এলোনা। বিষণ চাকরটা কোথায় গিয়েছে কে জানে? রোজই একবার ঐ উড়ো ঠাকুরের দলে ওর যাওয়া চাই—ই। 'রামা হো—রামা হো' করে কি যে ছাই চেঁচায় ওরাই জানে।

সত্যি-সত্যিই শেষে মণ্টুর দু'চোখ দিয়ে খানিক জল গড়িয়ে পড়ে।

মণ্টু এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। কিসের একটা স্বপ্ন দেখে মণ্টু জেগে উঠলো। বেশ করে হাত ছুটো দিয়ে চোখ রগড়ে নেয়—নাঃ ও—কিছু নয়! কয়েকটা ইঁছুর মেঝের উপর ছুটাছুটি করছে।

ও খাটের নীচে একঝুড়ি খাবার আছে। ছোট মামার বাসা থেকে পাঠিয়েছিল।

ঐ খাবারগুলি বুঝি ইঁছুরগুলো খেয়ে নষ্ট করে দিল।

মণ্টু চুপি চুপি উঠে। হাতের কাছেই জ্বলছিল আলোটা। সেটা তুলে নিয়ে এগিয়ে যায়।

এ কি! মণ্টুর পিছু পিছু কে আবার আসছে?

ভারী ত আশ্চর্য! ভয়ে একটু পিছিয়ে যায়। নাঃ ঐ যে কে আবার তার সঙ্গে সঙ্গে আসছেন।

টেবিলের উপর আর একটা আলো মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল। মণ্টু সেটাও বাড়িয়ে হাতে নেয়।

একি—এবার যে আরো অনেকগুলি মানুষ হলো। ঠিক একরকম দেখতে ওরা!

তবে কি ঘরে চোর এলো! চোর এলে ত এতক্ষনে সব নিয়ে যেতো। ওরা কেউ কথাও বলে না। সবাই চুপি চুপি হাঁটে। আবার সবাই দেখতে একরকম।

আর ভাবতে পারে না।

তাড়াতাড়ি আলো ছু'টো রেখে বিছানায় গিয়ে লেপ ঢাকা দেয়। রীতিমত ভয়ে কাঁপছে।

নিশ্চয়ই স্কুলের সেই ভূতটা!

যতদূর পারে মণ্টু আগাগোড়া লেপটা গায়ে দিয়ে পড়ে থাকে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মণ্টু কাঁদতে থাকে।

খানিক পরে মা ফিরে এলেন।

দেখেছো মণ্টুর কাণ্ড! ঘরের ছুয়োর না ভেজিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো ছুটো মাথার কাছে জ্বলছে। একটুও যদি বুদ্ধিশুদ্ধি

থাকে ওর !—মা বক্‌তে বক্‌তে ঘরে এলেন।

মশারী তুলে দেখেন বেচারা মণ্টু কাঁদছে।

কিরে, কাঁদছিস যে? তোকে আর একদিন নিয়ে যাবো।

মাকে দেখে মণ্টুর কান্না থেমে এলো।

অতি কষ্টে মণ্টু মাকে বোঝালে: মা—দুটো ভূত এসেছিল।

মা আর মেজদি কথা শুনে ত অবাক।

কি করে এলো?

মণ্টু তখন ব্যাপারটা খুলে বললো।

মেজদিও মন দিয়ে শুনছিল।

মেজদি বললো: আচ্ছা মণ্টু, ইঁদুরগুলোকে কি করে তাড়িয়ে দিলি?

কি করে আবার? এই দেখনা, বলে মণ্টু তখনি সেই দুটো আলো হাতে নেয়। পরে তাদের সে বুঝিয়ে দিতে থাকলো।

মণ্টু তখন চিৎকার করে বলছে—মা, ঐ দেখ দেয়ালের গায়ে কি—

মা আর মেজদি ওরা সবাই হেসে লুটোপুটি খায়। ওরা কেন হাসছে মণ্টু বুঝতে পারে না। বোকার মত ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মা মণ্টুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—বোকা ছেলে! ও ভূত নয়। ও যে নিজের ছায়া। আলোর ওপর পড়েছে।

মেজদি টিপ্পন্নি কেটে বললেন: কাল তোদের ক্লাশের ছেলেদের কাছে একথা বলে দেবো।

মণ্টু লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারে না।

হ্যাঁ—তোমারা কিন্তু মণ্টুর মত বোকা হয়ো না—ঐ আলোর ছায়ার ভূত দেখে। পরীক্ষা করে দেখো দু'টো আলোতে একটা লোকের সম্মুখ ও পিছনদিকে দু-দু'টো করে মানুষ পাশা-পাশি হাঁটবে। নিছক বানান নয় এ গল্প। সত্যি। সত্যি এ ঘটেছিল।

হারা-বংশীবীর

প্রথম দৃশ্য......স্থান—রাজপথ

চিতোর রাণা—(একা আপন মনে) উঃ, কি অপমান ! এর চেয়ে চিতোর রাণার মৃত্যুও যে ভালো ছিল। (পায়চারি করিতে করিতে চঞ্চল চিত্তে) সামান্য বুঁদিরাজ হামুসিংহের কাছে পরাজয় স্বীকার করব ? (একটু নীরব) কখনই না ! এই প্রতিজ্ঞা (দৃঢ়কণ্ঠে) আজ হতে সাত দিনের মধ্যে বুঁদির কেল্লা জয় করব...

[মন্ত্রী প্রবেশ করিতে করিতে]

মন্ত্রী—এ যে অসম্ভব রাণা !

রাণা—সামান্য বুঁদির কাছে আমার সহস্র সহস্র সৈন্যরা পরাজিত হয়ে ফিরে এল আর আমি হলুম বন্দী। সে দৃশ্য আজও আমি ভুলিনি। মন্ত্রী, সৈন্যদের আদেশ দাও রণসাজে সজ্জিত হতে।

মন্ত্রী—কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা যে আকাশকুসুম...

রাণা—(বাধা দিয়া) বুঁদির কেল্লা জয় না করা পর্যন্ত তোমাদের রাণা একবিন্দুও জল পান করবেন না মন্ত্রী, এই তাঁর পণ।

মন্ত্রী—(চমকিয়া উঠিলেন) এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নিন মহারাণা ! এ যে অসম্ভব। নিজেকে আত্মঘাতী করবেন না।

রাণা—মন্ত্রী, চিতোর রাণার পণ কখনও অসম্ভব নয়। আগামী প্রভাতে সৈন্যদের রণক্ষেত্রে অভিযান সুরু হবে।

(রাণার প্রস্থান)

মন্ত্রী—কি অদ্ভুত রাণার এই পণ ! স্বেচ্ছায় আত্মবলি ! চিতোরের সব কিছু বুঝি এবার চলে যায়। এ যে হবে তাঁর অসাধ্য সাধন !

[সেনাপতির প্রবেশ]

মন্ত্রী—এই যে সেনাপতি ! শুনেছেন রাণার পণ ?

সেনাপতি—নাঃ ! কিছু তো শুনিনি !

মন্ত্রী—আজ হতে সাত দিনের মধ্যে বুঁদির কেল্লা জয় না করে রাণা জলস্পর্শ করবেন না।

সেনাপতি—কি ভীষণ পণ! এ যে মৃত্যুপণ, মন্ত্রী। এর উপায়?

মন্ত্রী—উপায়? [চিন্তিত হইয়া] সেনাপতি, এই মৃত্যুর হাত থেকে রাণাকে রক্ষা করা চাই-ই।

সেনাপতি—রাণা তো জানেন বিগত যুদ্ধে মহাবলশালী হামু সিংহ কী বীর বিক্রমে রাণাকে পরাস্ত করে বুঁদির বিজয়পতাকা ওড়ালে। আর, রাণা সাত দিনে সেই বুঁদির কেল্লা জয় করবেন?

মন্ত্রী—তাইতো ভাবছি সেনাপতি, মহারাণাকে কি করে রক্ষা করতে পারি।

সেনাপতি—কোন উপায় তো দেখছি না মন্ত্রী। মহারাণার এ যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চত।

মন্ত্রী—চিতোরের রাণা ও তাঁর প্রতিজ্ঞা, দুটোই যাতে রক্ষা হয় তাই দেখতে হবে। [চারিদিক নিরিক্ষণ করিয়া] এস সেনাপতি, গোপন-মন্ত্রণা-কক্ষে যাই, এ বিষয়টা সেখানেই আলোচনা করা ভালো।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য……স্থান—বনপথ

[কুম্ভর প্রবেশ। কাঁধে তীর-ধনুক—পৃষ্ঠে মৃত হরিণশাবক। ঘর্মাক্ত দেহ। হরিণটা মাটিতে রাখিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বসিল]

কুম্ভ—যাক্ গে আর চলতে পারছি না; ওঃ। মা ভবানী! আর কত কাল রাণার রাজ্যে বন্দী হয়ে থাক্‌ব?—আমার দেশ—আমার জন্মভূমি কতদিন দেখিনি। [রাণার ভৃত্য কঙ্কনকে আসিতে দেখিয়া]…কি আপদ! কঙ্কন বুঝি……

[কঙ্কনের প্রবেশ]

কঙ্কন—আরে, কুম্ভ যে! আমাদের রাণার প্রতিজ্ঞা শুনেছ?

কুম্ভ—কি প্রতিজ্ঞা হে?

কঙ্কন—সাত দিনের মধ্যে তোমাদের রাজা হামুর বুঁদির কেল্লা আক্রমণ করবেন।

কুম্ভ—[চুপ করে থাকল]

কঙ্কন—কি ভাবছিস্ রে কুম্ভ ?

কুম্ভ—কঙ্কন, আমি আমার নিজের দেশে পালাব। আর তোমাদের রাজার অধীনে থাকব না।

কঙ্কন—এখন দেশে যেও না কুম্ভ, রাণা নাকি বুঁদির কেল্লা জয় না করে জলস্পর্শ করবেন না।

কুম্ভ—কঙ্কন তোমাদের রাণাটি তাহ'লে এবার গেলেন !

কঙ্কন—হাঃ। হাঃ। হাঃ। তুমি বুঝি তাই ভেবেছ ? আরে, রাণা তোমাদের বুঁদি রাজ্যেই যাচ্ছেন না।

কুম্ভ—তবে ?

কঙ্কন—বুঁদির কেল্লার মত এখানে নকল কেল্লা গড়াচ্ছেন। নাম হবে তার 'বুঁদির গড়' '

কুম্ভ—তারপর ?

কঙ্কন—তারপর আক্রমণ করবেন রাণা সসৈন্যে নকল গড়। মন্ত্রীমশায় এ পরামর্শ দিয়েছেন।

কুম্ভ—এর মানে ? এ তো ছেলেখেলা ! এর নাম আবার যুদ্ধ !

কঙ্কন—হাঁ রে, হাঁ। অপমানের প্রতিশোধ, বুঁদির কেল্লা ধুলিসাৎ করার অভিনয়। রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা। রাজরাজার কাণ্ড, গরীবের বোঝা ভার ! চল্লুম— (কঙ্কনের প্রস্থান)

কুম্ভ [নিজ মনে] নকল গড় জয় করে আমার রাণা হামুকে অপমান করবে ? আমার বুঁদির অপমান ! [উঠিয়া] চিতোরের রাণা কখনই আমার বুঁদির কেল্লা জয় করতে পারবে না। আমি বুঁদির সন্তান এখানে আছি। জয় মা ভবানী—

[মৃত হরিণ ও তীর ধনুক লইয়া প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য...স্থান—অনতিদূরে নবনির্মিত বুঁদির গড়

[দূর হইতে নকল গড়ের চূড়া দেখা যাইতেছে]

কুম্ভ—আমার দেশ, আমার মা, আমার রাণার সম্মান রক্ষা করব আমি। দেখি, কে নকল বুঁদির গায়ে হাত দেয়। কেউ পারবে না—

[সৈন্য সামন্ত সহ সেনাপতির আগমন]

সেনাপতি—কুম্ভ, তুমি এখানে কেন ?

কুম্ভ—আমি আজ বুঁদির প্রতিনিধি। নকল গড় রক্ষা করব সেনাপতি।

সেনাপতি—কি বল্‌ছ তুমি ?

কুম্ভ—আপনার রাণাকে গিয়ে বলুন, বুঁদির সন্তান কুম্ভ জীবিত থাকতে নকল গড় জয় করা তাঁর সাধ্য নয়।

সেনাপতি—আরে বেইমান! দুষমন! এখনি সরে যা। নইলে নকল বুঁদির গড়ের সঙ্গে তোর মুণ্ডুও ধূলিসাৎ হবে।

কুম্ভ—[হাসিয়া] বেশ তো! এ জীবন নিয়ে কি হবে ? নিজের দেশের সম্মান—রাজার সম্মান রক্ষার জন্য আমি প্রাণ দেব।

সেনাপতি—[ক্রুদ্ধস্বরে] কুম্ভ, এতদিন রাণার আশ্রয়ে থেকে শেষে বেইমানি করছিস্। শান্তভাবে শোন, কেন মিথ্যে প্রাণ হারাবি ? ও তো আর সত্যি বুঁদির গড় নয়, নকল গড়।

কুম্ভ। হোক নকল গড়, তবু আমার দেশের বুঁদির নাম পেয়েছে ও! বুঁদির অপমান কিছুতেই সইতে পারব না। আমাকে পরাজিত, বন্দী বা হত্যা না করা পর্যন্ত তোমরা কেউ আমার দেশকে অপমান করতে পারবে না।

(অসি উন্মুক্ত করে নকল গড়ের সম্মুখে দাড়াইল)

[রাণার প্রবেশ]

রাণা—সেনাপতি! এখনও গড় আক্রমণ করনি ?

সেনাপতি—মহারাণা, কুম্ভ গড় আক্রমণে বাধা দিচ্ছে।

রাণা—(সচমকে) এঁ্যা! কুম্ভ! বুঁদির বন্দী—সেই কুম্ভ? আমার আশ্রিত?

সেনাপতি—হঁ্যা প্রভু।

রাণা—বিশ্বাসঘাতক! এতদিন আমার অন্নে পালিত হয়ে—এখনি ওর মুণ্ডু স্কন্ধচ্যুত করে দাও—

[সৈন্যদের অবিলম্বে গড় আক্রমণ]

[রাণা ও মন্ত্রী গড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল]

রাণা—ব্যাপার কি মন্ত্রী?

মন্ত্রী—কুম্ভ একাই বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছে মহারাণা!

রাণা—বীর বটে!

[কুম্ভর রক্তাক্ত মস্তক সহ সেনাপতির আগমণ]

সেনাপতি—মহারাণা, গড় অধিকার করেছি। এই নিন কুম্ভর ছিন্ন শির। এই সেই কুম্ভ, যে বুঁদির নকল গড়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে স্বদেশের মান রক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিল। বীর বটে!

[এ দৃশ্য দেখিয়া মহারাণা চোখে হাত চাপা দিলেন]

পতিতপাবণ

পাতিতপাবন আর ধর্মহার ছুই বন্ধু। শুভ দিনক্ষণ দেখে ছুই বন্ধু তীর্থভ্রমণে বের হ'ল। পায়ে-হাঁটা পথ। হেঁটেই চল্‌ছে। মাঝে মাঝে গাঁয়ের পথে থামে, বিশ্রাম করে। আবার হাঁটতে থাকে। দিনের আলো ডুবে আসে। রাতের অতিথি হয় কখনো পান্থশালায় আবার কখনো কারও গৃহে। তীর্থ-যাত্রার পথে ছুই বন্ধু এমনি করে এগিয়ে চলে।

ধর্মহরি তীর্থ ভ্রমণে এসে পিছনের ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না বন্ধু পতিতপাবনকে বলে, "পতিত, বড় ছেলেটার উপর ক্ষেতের ফসলের ভার দিয়ে এসেছি। সময় মত কাজ করবে কিনা কে জানে!"—একটু থেমে আবার বলে, "ও-বাড়ীর হলধরের কাছে গত বৎসরের পাওনা টাকার সুদ পাওয়া যায়নি, সেটা দেবার জন্য তাগিদ দিয়ে এসেছি।"—এমনিধারা ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি কথা ধর্মহরি ব'লে চলে। পতিতপাবন শুনে যায়। মুখে কিছুই বলে না। পতিতকে নীরব দেখে ধর্মহরি একটু অধৈর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা পতিত, তোমার ঘর-বাড়ীর জন্য ভাবনা হচ্ছে না?"

পতিত জবাব দেয় ছোট একটি কথায়—"না ভাই, ঐ একজনার উপরেই ভার দিয়ে এসেছি।"

"কার উপর ভার দিয়ে এলে?—প্রশ্ন করে ধর্মহরি।

"যিনি মাথার উপর আছেন"—প্রত্যুত্তর দিল পতিত। টাকার থলি নিয়ে ধর্মহরি হিসাব করে। পথে আস্‌তে রাহা-খরচ কত হ'ল, আর মোট তহবিলে কত আছে, তা-দিয়ে কদিন চলতে পারে তার হিসাব করে আপন মনে।

আর একটি সপ্তাহের পরই পীঠস্থানে পৌঁছতে পারবে। সেখানকার

সাগর-সলিলে অবগাহন করে পাপতাপ ধুয়ে মুছে যাবে। মন্দির দর্শন করে সারা হৃদয় আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠবে। দেবতার আশীষ লাভ করে জীবন ধন্য হয়ে উঠবে। তীর্থ-ভ্রমণ হয়ে উঠবে সাফল্যময়। ধর্মহরির মন ঐ কথা বলে ওঠে।

তীর্থযাত্রার পথে এক অঘটন ঘটল। পথের ধারে একজন জীর্ণশীর্ণ লোক পড়ে আছে। রোগে ভুগছে। তাই ক্ষীণশক্তি…অনাহারে দুর্বল…কণ্ঠস্বর নিঃস্তেজ…। পাঁজরার হাড়গুলি গোনা যায়। ধর্মহরি ও পতিতপাবন এখানে এসে থামল। পতিতপাবনকে ধর্মহরি বলল, "এখানে থাকলে হয়ত আমাদের অসুখ-বিসুখ হতে পারে। তাছাড়া তীর্থে চলেছি…যত আগে যাওয়া যায় ততই ভাল!…" পতিতপাবন এ কথার কী জবাব দেবে? শুধু বলল, "ধর্মহরি, তুমি এগুতে থাক …আমি কয়েকদিন পরে এখান থেকে যাব।"

ধর্মহরি পতিতের মনের কথা বুঝতে পারল। একটু রেগেই বন্ধুকে বলল, "হুঁ, বুঝেছি তোমার মতলব! তুমি এখানে ওর সঙ্গে থাকতে চাও। আগে জানলে তোমার সঙ্গে আসতাম না।…" এই ব'লে ধর্মহরি তার পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে ফেলে। একবারের জায়গায় দশবার তহবিল হিসাব করে।

"রাগ করলে ধর্মহরি? দেখো, ঠিক আমি যাব…একটা কি দুটো দিন বৈ তো নয়!" পতিতপাবনের কথা কানে গেল না। ধর্মহরি পিঠে পোঁটলা ঝুলিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। হিসাব করে দেখে…আর সাতদিন সময় লাগবে তীর্থস্থানে পৌঁছতে।

এদিকে পতিত ঐ অসুস্থ লোকটাকে কি করে ভাল করে তুলবে, তাই হ'ল সমস্যা।

…বলো, চোখের উপর একটা লোক রোগে কষ্ট পাচ্ছেন তাকে কীকরে ফেলে যায়? যাক্, পতিত নিজের হাতে সেবা করে… দিনরাত তার পাশে বসে থাকে…ঐ গাঁয়ের ডাক্তার ডেকে এনে দেখায়। ধীরে ধীরে সে ভাল হয়ে ওঠে। এখন বসতে পারে।

একটু একটু হাঁটতেও পারে। বেচারার এ সংসারে আপনজন কেউ নেই। এক ছেলে ছিল, সেও এক বছর হল মারা গিয়েছে। কে আর তাকে খেতে দেবে? এ-গাঁ ও-গাঁয়ে ভিক্ষা করে যা পায় তাই খায়। বয়সও হয়েছে অনেক। চোখে এখন ভাল দেখতে পায় না। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে সে হাঁটে।

বুড়ো জিজ্ঞসা করে পতিতপাবনকে—"তুমি কে ভাই? তোমার গাঁ কোন্‌খানে? কোথায় যাবে?

"আমি সামান্য একজন চাষী। থাকি নন্দপুর গাঁয়ে। তীর্থ ভ্রমণে যাচ্ছিলাম।"—পতিতপাবন ধীরে ধীরে কথাগুলি বলল।

"জানো ভাই, এই পথ দিয়ে অনেক লোক তীর্থভ্রমণে যায়। আমি এখানেই পড়ে থাকি···একটিবার কেউ মুখ ফিরেও দেখে না। তুমি আর দুটো দিন এখানে থাকবে না?···"

"না ভাই, আবার যখন আসব, তখন তোমার সঙ্গে দেখা করব।"···পতিতপাবন তাকে ঐ কথা বলে।

পতিত হিসাব করে দেখে···এখানে পনেরদিন হ'ল আছে। তার হাতে যা পয়সাকড়ি ছিল তা সবই ফুরিয়ে গেছে। তাছাড়া তীর্থে গিয়ে এখন লাভ নেই। তীর্থ-মন্দিরের দেবতার উৎসবও শেষ হয়ে গেছে। যে-যার ঘরে এখন ফিরে চলেছে। কাজেই এখন তীর্থে গিয়ে লাভ নেই। যাক্‌গে···পতিত যে একজন রুগ্ন লোককে ভাল করে তুলতে পেরেছে, এটাই তার আনন্দের কথা।

পতিতপাবন বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নেয়। সত্যি, বুড়োর চোখ দুটো কেমন ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে। শুধু সে পতিতকে বলে, "তোমার ভাল হবে, দেখো! আবার এস কিন্তু!"

পতিতপাবনের আর তীর্থভ্রমণে যাওয়া হ'ল না। বাড়ীতেই সে ফিরে এল। পতিতকে দেখে সবাই জিজ্ঞাসা করল, "কেমন দেখলে? কি কি দেখলে? ধর্মহরি যে এখনো ফিরে এল না?"—

পতিত তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না। সে চুপ করেই

থাকে। শুধু বলল, "ধর্মহরি তার পিছনে আসছে। সে ভালই আছে।" পতিতপাবন কিন্তু ঐ বুড়োর কোন কথাই বল্‌লো না। সে সব গোপন করে রাখলো।

আগের মতই সে ক্ষেতের কাজ করে যায়।

এ দিকে হ'ল কি জান?

ধর্মহরি ঠিক সময় তীর্থমন্দিরে গিয়ে হাজির হয়। ধর্মশালায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। নানা দেশ থেকে লোক এসেছে। দেবালয়ে নানা কারুকার্যের শোভা মন্দিরের ভিতরে ধূপ-প্রদীপের বিপুল সমারোহ! ঠাকুরের দেবীর কাছে ফুলে ফুলে ছড়িয়ে আছে। বড় বড় আয়না রয়েছে দেওয়ালের গায়ে। দেবতা মন্দিরে লোক ভরে গেছে।

ধর্মহরি একটু আগে আসে। নিজের জায়গা করে নেয়। তার মনে হয়, পতিতপাবন কি তবে এল না? সে তো বলেছিল, আসবে। কেন এল না? দু'বন্ধুতে ছোটবেলা থেকে বড় ভাব। একসঙ্গে এক গাঁয়ে পাশাপাশি থাকে।...ধর্মহরির রাগ হয় পতিতের উপর। কোথায় দু'বন্ধু একসঙ্গে তীর্থে আসবে...না মাঝপথে পতিত রয়ে গেল ঐ রোগা লোকটার কাছে! ধর্মহরি চারদিক তাকায়...কোথাও পতিতকে দেখতে পায় না।

একসময় ধর্মহরি চেঁচিয়ে ওঠে..."ঐ যে পতিত, তুমি এসেছ।" উঠে দাঁড়ায়...একটু এগিয়ে যায়।

যেখানে ঠাকুরের বেদী রয়েছে, তার পিছনে আছে বড় বড় আয়না ...ঐ আয়নায় সে দেখে পতিতপাবনকে...পতিত হাসছে—বাঃ, পালিয়ে গেল! আর সে পতিতকে দেখতে পায়না। খুঁজেও পায় না পতিতকে।

ধর্মহরির মনে বড় দুঃখ হয়। পতিত আমার সঙ্গে দেখা করল না...হয়ত সে আমাকে খুঁজে পায়নি ব'লে রাগ করে থাকবে। যাক্‌গে, এখনি শুরু হবে ঠাকুরের আলোচনা।...ধর্মহরি মন দিয়ে ঠাকুরের কথা শোনে।

ঐভাবে পর পর কয়েক দিন কেটে গেল।

এবার ফিরে যাবার সময় হয়ে এল। ধর্মহরিও বাড়ী ফিরে যাবার উদ্যোগ করল। মাঝে মাঝে সে ভাবে…পতিত এসেই চলে গেল…একটিবার দেখাও করল না। সে কি তবে ভুল দেখেছে? নাঃ, এতটুকুও ভুল নয়। সেই জামাকাপড়ই সে পরেছে—ধর্মহরির মনে বিশ্বাস আরও গভীর হয়।

ধর্মহরি ঠিক সময় বাড়ী ফিরে এল। বাড়ীতে ফিরে এসে সে পতিতপাবনের সংবাদ নিতে গেল।

"এই যে পতিত…" একটু দুঃখের সঙ্গে বলে, "বেশ মানুষ তুমি! আমাকে একা ফেলে চলে এলে? আমি তোমাকে মন্দিরের ভিতর দেখতে পেয়েছি, অথচ তুমি আমাকে দেখতে পেলে না। তোমার নাম ধরে ডাকলাম, কত খোঁজ নিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে ফেলে আগে আগে বাড়ী ফিরে এলে!"

পতিতপাবন তো একথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। এ-কথার কোন প্রতিবাদও করল না। চুপ করেই থাকল সে।

শুধু ছোট একটি কথায় পতিতপাবন জবাব দিল, "ধর্মহরি, তুমি ভুল দেখছ।"

ধর্মহরি তেমনি করে বলল, "মিছে কথা কেন বলছ? তুমি একা ফিরে এসেছ তাতে কি হয়েছে?"

এই সময় পতিতপাবনের ছোট ছেলে ফটিক বই পড়ছিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে…"যে ব্যক্তি অন্ধ, আতুর, খোঁড়া, রুগ্ন ও পীড়িতের সেবা করে—ভগবান তার প্রতি সদয় হন এবং সে ব্যক্তি তীর্থযাত্রীর চেয়ে বেশী পুণ্যবান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হয়।"

আমাদের পাঁচু

সত্যি সত্যি গল্প নয়! পাঁচু আজো বেঁচে আছে। এতোটুকুও মিথ্যে নয়, একেবারে পাঁচুর জীবনের সত্যিকার কাহিনী।

বেশ মনে আছে, ওকে প্রথম দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

ঐ ছেলের একমুখ গোঁফ-দাড়ি আর ঘাড় অবধি লম্বা চুল।

ভাবছো, সন্ন্যাসী বা ভবঘুরে? মোটেই নয়! ওর সখ ছিল বড় হয়ে দশজনের সঙ্গে সমান তালে চলবে।

কি করে চলবে?

আজ ওর বন্ধুরা ওকে ঘৃণা করে। ওকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। সত্যি, বন্ধুরা এত সহজে ভুলে গেল! আশ্চর্য মোটেই নয়।

পাঁচু একদিন অবিশ্বাসী, প্রতারক প্রবঞ্চক বলে পরিচিত হল বন্ধুমহলে।

পাঁচু সেদিন তাদের বল্‌তে চেয়েছিল, আমার কি দোষ? কত তো চেষ্টা করলুম, সামান্য একটা কাজ জোটাতে। কেউ একটিবার মুখ তুলে চাইলে না। কতদিন আর না খেয়ে থাকা যায়! তোরা বড়লোক! টাকার মানুষ। আমি বাঁচব। বড় হব। এই তো আশা ছিল! তা আর হ'ল কৈ! কতদিন আমার ছোট ভাঙা ঘরটিতে বসে বসে ভগবানকে ডেকেছি। কই সে ভগবান? মা তো শেষপর্যন্ত ওষুধ পথ্যির অভাবে মারা গেলেন। দুঃখ হ'ল মনে। তোদের এত টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও আমার মাকে বাঁচাতে পারলুম না। আমি না খেয়ে খেয়ে কি হয়ে গিয়েছিলুম। শেষে বাধ্য হয়েই আমাকে সিঁদ্‌ কাটতে হ'ল।

বন্ধু অমিতের বাড়ী চুরি করতে গিয়ে পাঁচু ধরা পড়ল।

আর কি! সঙ্গে সঙ্গে হাজত বাস।

বন্ধুরা সব ছিঃ ছিঃ করে উঠল।

এদিকে তো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'ল হাকিমের সুমুখে।

পাঁচু হাকিমকে করুণ আবেদন জানিয়ে বলেছিল, হুজুর অন্যায় কি করেছি? ওরা মটরে চড়ে মাঠে হাওয়া খায়। সিনেমায় যায়; আর আমি একমুঠো—

হাকিম ওকে আর কিছু বলতে দিলেন না।

'চুরি করা মহাপাপ।'

হাকিম দিলেন রায়—সশ্রম জেল এক বছর।

সেই কয়েদীর মত হাতে বেড়ী, কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ পাঁচুকে নিয়ে গেল জেলে।

ঠিক এক বছর পরে জেল থেকে ও খালাস পেল। এতো দিন তো জেলে দাড়ি, গোঁফ, চুল কাটেনি বলেই ঐ দশা।

আজ ওর মুক্তির দিন। পৃথিবীর আলোর পরশ পেল।

যারা ওকে সেদিন চিনতে পারল, তারা বললো—চোর পাঁচু। ওর সঙ্গে মিশ্‌তে নেই।

ব্যথা পেল মনে। ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে বলে—ওরে, আমি এখন ভাল মানুষ হয়ে গেছি। জেলে যাবার দুদিন পরই তো আমার অনুতাপ হয়েছে। চোর নয় আমি। সত্যি তোরা বিশ্বাস কর। পাঁচুর মনের কথা কিন্তু কেউ বুঝলে না। সকলেই পাঁচুকে ঘৃণা করে। পাঁচু সব সইতে পারে, শুধু পারে না সইতে বন্ধুদের উপহাস।

মনতোষের দেখা হ'ল পাঁচুর সঙ্গে। পাঁচুই বললো, মনতোষ, ওরা আমাকে কেউ বিশ্বাস করে না। ভাবে, আজো বুঝি আমি চো—ও—র—শেষের কথাটি বলতে পাঁচুর চোখ দুটি ভেসে উঠেছিল দু-ফোঁটা জলে।

মনতোষ দরদীর ভাব দেখিয়ে বললো—তাইতো। বল, আমি আর কি করতে পারি।

তাড়াতাড়ি মনতোষ ওর কাছ থেকে ছুটে যায় বন্ধুদের কাছে। তাদের হাঁফ ছেড়ে বলে, জানিস্ চোর পাঁচু-টা কি বলছিল?

ইনিয়ে-বিনিয়ে মনতোষ পাঁচুর নামে অনেক কিছু বলে গেল।

পাঁচু সত্যি সত্যি ভাল ছেলে হয়ে গিয়েছিল। দুঃখের কথা, পাঁচুকে কেউ বিশ্বাস করে একটা কাজও দিলো না। সকলেই বলে, চোরকে কাজ দিলে, সে আবার চুরি করতে পারে।

পাঁচুর বার বার মনে হ'ল ভাল হলুম অথচ এ দশা!

জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে যেন আরো বিপদে পড়লো। না খেয়ে থাকার মত অবস্থা!

ভাবলো, জেলে বন্দী হয়ে দিব্যি ভাল ছিলুম। তবু দু-বেলা খেতে পেতুম লপ্‌সি। চোরগুলো তো খারাপ ছিল না। কারো অসুবিধে হ'লে ভাইয়ের মত দেখতো।

এর পরের ঘটনা :—

কিছুদিন পর পাঁচু আবার ধরা পড়েছে চুরির অভিযোগে।

সবে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার চুরির দায়ে আসামী হ'ল পাঁচু।

হাকিম তাকে এবার বেশী করে সাজা দিলেন দু-বছর।

পাঁচু এবার জেলে যাবার সময় হাসিমুখে বলেছিল—হুজুর, আমার ঐ জেল-ই ভাল।

ওর এ-কথা শুনে অনেকেই বলেছিল, পাঁচুকে রাঁচির পাগলা-গারদে পাঠানো উচিত ছিল।

সেই পরিচিত পুণ্যতীর্থ জেলেই পাঁচু বন্দী আছে।

দিনগুলো ওর মন্দ কাটছে না! দু-বেলা রাজভোগ লপ্‌সি খেতে পায়। কিছুকাল পর পাঁচু কেমন বদ্‌লে গেছে। জেলের ভিতর কারো সঙ্গে কথা বলে না। চুপ করে নিজের নিরালা ঘরে বসে ভাবুকের মত কি সব ভাবে।

মাঝে মাঝে পাঁচুর একটা কথা মনে আসে, এ-জেল থেকে যখন মুক্তি পাবো তখন কোথায় বা থাক্‌বো আর কি-ই বা খাবো?

পাঁচুর একটা ধারণা হয়ে গেছে বন্ধুদের প্রতি :—পাঁচুর এ-হেন অবস্থার জন্য ওরাই দায়ী।

মায়ের পূজা

শরতের সোনালী প্রভাতে নহবতের সুর বেজে উঠল ভৈরবীতে। জমিদার বাড়ীতে পূজা। কত লোকের আনাগোনা, তাদের আনন্দের ঝঙ্কারে চারদিক মুখরিত। সহর থেকে যাত্রার দল আনা হয়েছে। গ্রামের ছেলেরা সখ করে এবার অষ্টমীর দিনে 'সীতা' অভিনয় করবে।

আজ এত আনন্দ উৎসবের মধ্যে গাঁয়ের পূবদিকে ঐ ছোট্ট জীর্ণ কুঁড়েখানি বিষাদে ভরা। দুঃখ-দৈন্যর ভিতর দিয়ে চলেছে তাদের জীবনসংগ্রাম।

সবাই মায়ের আগমনের সাথে সাথে পুরোনো দিনের হারানো সুরগুলি মুছে ফেলে।

হরিশের মরম-বীণার তারগুলি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে অতীতের ব্যথায়। ঠিক এমনই দিনেই তো ওর স্ত্রী মারা গিয়েছিল। সংসারে কেবল মেয়ে রঙ্গিলা আর ছোট ছেলে রাখাল।

হরিশ নমঃশূদ্র। লোকের বাড়ীতে মজুরীর কাজ করে যা দু'পয়সা জমিয়েছিল, তাও খরচ হয়ে গেছে ছেলেটার অসুখে। সে রোগে ভুগছে অনেকদিন ধরে।

সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে কোন রকমে হরিশ দেহটা টানতে টানতে হাজির হয় বাড়ীতে।

রঙ্গিলা বাবার কাছে এসে জানায়—রাখালের জ্বর বেড়ে গেছে।

হরিশ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলে। হাত দিয়ে দেখে, গা পুড়ে যাচ্ছে!

রাখাল চোখ মেলতেই খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ে। চোখের জলটা মুছিয়ে দিয়ে হরিশ স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করে—"রাখাল, এখন কেমন লাগছে?"

—"বাবা, একটু জল!"

ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে ফেলে রাখাল বলে—"বাবা, বল্ কই?"

কিছু ভেবে ঠিক করতে পারে না। হরিশকে মিথ্যা কথা বলতে হয়—"দোকানে যে আজ বল্ ওঠেনি, বাবা!"

"হ্যাঁ, তোমার রোজ রোজ একই কথা। সব বিথ্যে, মিথ্যে"—অভিমান করে রাখাল মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখে। হরিশ বৃথা সান্ত্বনা দিতে থাকে।

সেদিন ও-পাড়ার বাবুর ছেলেদের বল্ দেখে রাখাল বায়না ধরেছিল—তার একটা বল্ চাই। সত্যিই তো হরিশ এতদিন দেবে দেবে ব'লে আশা দিয়ে এসেছে।

পূজার বাড়ীতে ঢাক বেজে ওঠে। রাখাল বলে—"বাবা' পূজো দেখবো, নিয়ে চলো!"

হরিশ বুঝিয়ে বলে—"অসুখ ভাল হোক্, নিয়ে যাবো।"

হরিশের মনে পড়ে, রঙ্গিলা জংলাশাড়ী চেয়েছিল। পূজার সময় দেবে বলেছিল, দিতে না পারায় হরিশের দুঃখের অন্ত নেই। কি করবে, ধার চেয়ে কোথাও পায় না।

যাদের কাছ থেকে টাকা এনেছিল, গতর খাটিয়ে শোধ করেছে তাদের ঋণ। তবু কেউ বিশ্বাস করতে চায় না হরিশকে।—সে গরীব।

স্ত্রীর সুন্দর মুখখানি হরিশের মনের মুকুরে ভেসে ওঠে। কত দুঃখই না সে পেয়েছে। চোখ দুটির পাতা ভারী হয়ে ওঠে।

হঠাৎ রাখাল চীৎকার ক'রে ওঠে। হরিশের চিন্তা গুলিয়ে যায়, বলে—"কি হয়েছে রাখাল?"

রাখাল অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে। হরিশ দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ভেসে-আসা অস্পষ্ট দিনের কয়েকটি কথা রঙ্গিলার মনে পড়ে। মা'র অসুখের সময় রঙ্গিলা কাছে ব'সে থাকৃত, রাখালকে বুকে রেখে,

মা কত কথা বলতেন। মা বলতেন—"যাদের সংসারে কেউ নেই তাদের ভগবান আছেন।" এই কয়েকটি কথা রঙ্গিলার মনের কোণে দাগ কেটে ব'সে আছে। সে বোঝে বাবার দৈন্য, মায়ের অভাব, স্নেহের ছোট ভাইটির অসুস্থতা।

এই সময় রঙ্গিলার সাথী লক্ষ্মী এসে বলে—"রঙ্গিলা, ঠাকুর দেখতে যাবিনি? চল্ না?"

"ভাই, রাখালের অসুখ। বাবা তো এখনও এলো না। সন্ধ্যা হয়ে এলো। ঐ যে বাবা আসছে।"

রঙ্গিলা বলে—"বাবা, রাখাল তো এখন চুপ করে আছে, বাবুর বাড়ী আমি ঠাকুর দেখে আসি। আজ অষ্টমীপূজা।"

"আচ্ছা যা।"

রঙ্গিলা রঙিন মিলের শাড়ীখানি পরে—মাথার চুলগুলি ঝুঁটি করে বাঁধে।

"লক্ষ্মী, একটু দাঁড়াও ভাই, আলোটা জ্বেলে ধূপ-ধুনা দিয়ে আসছি।"

রঙ্গিলা তুলসীতলায় মাটির প্রদীপটা রেখে বেদীতে প্রণাম করে প্রার্থনা করে—"ঠাকুর, রাখালকে ভাল করে দাও।"

পূজার বাড়ীতে সন্ধ্যায় আরতির কাঁসর-ঘণ্টা শুনতে পাওয়া যায়। গ্রামের সবাই এসেছে মায়ের আরতি দেখতে। এদিকে ছেলেদের থিয়েটার হবে, তার সোরগোল পড়ে গেছে।

লক্ষ্মী তাড়া দিয়ে বলে—"চল্ শীগগির রঙ্গিলা!"

দু'জনে বেরুলো। খানিকটা গিয়ে লক্ষ্মী কি যেন মনে পড়ে।

মিনতি করে রঙ্গিলাকে বলে—"রঙ্গিলা, ভাই, আমি একটা কাজ ভুলে এসেছি। রাগ করিস্‌নে ভাই—তুই এগিয়ে চল্। আমি এখনই বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি।"

রঙ্গিলা ঠাকুরমণ্ডপের এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন আরতি চলেছে। পুরোহিত ধূপ-ধুনা দিয়ে দেবীর আরতি করছেন। স্থির

অপলক দৃষ্টিতে রঙ্গিলা ভাবে বিভোর হয়ে মায়ের সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে থাকে। ভক্তিতে হৃদয় আপ্লুত। সারা দেহে যেন একটা শিহরণ জাগে। আপন হারা হয়ে যায় মায়ের আরতির মাঝে। খেয়াল নেই। পূজার দালানের দিকে এগিয়ে যায় একটু একটু করে।

আরতির শেষে সকলে মাকে প্রণাম করে। রঙ্গিলাও কাপড়ের আঁচলটা গলায় জড়িয়ে, মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে। মিনতি করে জানায়—"মা গো, আমরা যে বড় গরীব। রাখালকে ভাল করে দেও।" মানত করে দেবীর কাছে। সাথে সাথে দুফোঁটা জল চোখ হতে ঝরে পড়ে মাটিতে।

কিসের এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠে রঙ্গিলার।

পুরোহিতঠাকুর সকলকে মায়ের চরণামৃত দিচ্ছিলেন। রঙ্গিলাও হাত দুটিযোড় করে এগিয়ে দেয় মায়ের চরণামৃতটুকু পাওয়ার আশায়।

পিছন থেকে কে যেন ব'লে ওঠে—"এ যে রঙ্গি, হরিশের মেয়ে—না?"

ভট্টাচার্যমশায় রঙ্গিলাকে দেখে আঁৎকে উঠে বললেন,—"এঁ্যা, রঙ্গিই তো। এখানে এসেছিস?" মুহূর্ত্তের মধ্যে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বকতে লাগলেন, "কি স্পর্দ্ধা ছোটলোক! চাঁড়ালের মেয়ে চাঁড়ালের মেয়ে একেবারে মায়ের মন্দিরের ভিতর এসেছিস্? সর্বনাশ কর্‌লি—সব অপবিত্র কর্‌লি? যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে।"

রঙ্গিলা ধীর, স্থির। ভাষা নেই তার মুখে। মৌনতার ভিতর দিয়ে তার ভাষা মুখর হয়ে ফুটে ওঠে। ভাবে—কি অপরাধ করেছে সে, এখানে এসে! রঙ্গিলা তো ওর মায়ের মুখে শুনেছে যে, ঠাকুর সকলের এক। সবাই মায়ের সন্তান।

সে ছোট অবুঝ শিশুর মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

জমিদারবাবু আরতি দেখছিলেন, একটা হুঙ্কার তুলে এগিয়ে এসে বললেন—"কি সাহস ছোটলোকের মেয়ের—আমার পূজার সব আয়োজন অপবিত্র করে দিলি? কে এখানে আছিস, দে তো একে

দূর করে তাড়িয়ে।"

রামধনিয়া চাকর কাছেই ছিল। রঙ্গিলাকে ধাক্কা মারতেই সে উঠানে একটা ইঁটের উপর পড়ে যায়। মাথার খানিকটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে।

রঙ্গিলা অস্ফুট স্বরে "মা গো, উঃ। ব'লে আজ্ঞান হয়ে পড়ে। একটা হৈ চৈ পড়ে যায়।

হরিশ বাড়ী থেকে শুনতে পায় ঠাকুরবড়ীতে রঙ্গিলাকে মেরেছে। ভয়ে ছুটে যায়। রঙ্গিলার অবস্থা দেখে হরিশ কাঁদ কাঁদ স্বরে চীৎকার করে বলতে থাকে—"এ্যাঁ, আমার মেয়েটাকে মেরে ফেল্‌লে। এ কি করেছে তোমাদের? আমরা ছোটলোক ব'লে কি তোমরা এত অত্যাচার করবে—আমার দুধের বাছাকে মেরে খুন করে ফেলবে? এত অত্যাচার ধর্মে সইবে না। গরীব ছোটলোকের প্রাণ—প্রাণ নয়? গরীবের ছেলেমেয়ে—ছেলেমেয়ে নয়? গরীব বাপ-মায়ের প্রাণে তাদের ছেলেমেয়ের জন্য ভালবাসা থাকে না? কে আমার বাছাকে মেরেছে—এসো, আমাকেও মেরে ফ্যালো—আর সহ্য করতে পারছি নি।..."

হঠাৎ হরিশের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। সামনে লাঠির মত একখানি বাঁশের ডগা ছিল—কুড়িয়ে নিয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"খুন করব—যে আমার মেয়েকে মেরেছে, তাকে খুন করব।"

হরিশের রুদ্রমূর্তি ও স্পর্দ্ধা দেখে পুরোহিত মাতৃ-মূর্ত্তির পিছনে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু জমিদারবাবুর হুকুমে ইতিমধ্যে হরিশের পিঠে দু'দশ ঘা জুতা, চড়, কীল পড়ে গেল। হরিশ মার খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।

ছেলের দল রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে এসে দাঁড়ালো। ছুটোছুটি করে কেউ বা জল নিয়ে আসে, কেউ পাখা দিয়ে বাতাস করে। কেউ চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দেয়।

জমিদার-গৃহিণী অন্নপূর্ণা দেবী মায়ের আরতি দেখছিলেন। এই

সব গোলযোগ শুনে তিনি মন্দির ছেড়ে বাইরে আসেন। দেখতে পান, রঙ্গিলার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। কাছে এগিয়ে এসে, রঙ্গিলার মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলে নেন। নিজে তার চোখে ও মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দেন ও হাওয়া করতে থাকেন।

অনেকক্ষণ পরে রঙ্গিলা ধীরে ধীরে চোখ মেলে। অন্নপূর্ণা দেবী সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "ভয় কি, মা?" রঙ্গিলা উত্তর দেয় না, উদাস ভাবে অন্নপূর্ণা দেবীর পানে তাকিয়ে থাকে।

হরিশ একটু সুস্থ হয়ে রঙ্গিলাকে বলে—"রঙ্গিলা, চল্‌, ঘরে ফিরে যাই।" অন্নপূর্ণা দেবীকে প্রণাম করে বলে, "মা, ছেলেটার বড় অসুখ, একলা রয়েছে।"

অন্নপূর্ণা দেবী সান্ত্বণা দিয়ে হরিশকে বললেন—"হরিশ, তোকেও মেরেছে? দুঃখ করিস নি বাবা। তোর মেয়ের মত আমারও মেয়ে আছে। যে আঘাত তোদের দেহে এরা দিয়েছে, সে আঘাত আমার বুকে গিয়ে বিঁধেছে।"

যাবার বেলায় হরিশ আর একবার অন্নপূর্ণার পায়ের ধুলো নেয়। রঙ্গিলাকে কোলে করে ফিরে আসে বাড়ীতে। ছেলেরা হরিশকে বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে।

আজকের বিরাট উৎসবের মাঝে একটা বিষাদের ছায়া পড়ে।

জমিদারবাবুর কিছুই ভাল লাগে না। মনটা অশান্তিতে ভরে ওঠে—বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকেন। তাঁর ঘুম আসে না অনেক রাত পর্যন্ত। শেষরাতে তাঁর চোখ দুটি বুজে এলো। কি একটা স্বপ্ন দেখে চীৎকার করে জেগে উঠে অন্দরের দিকে ছুটে গেলেন। অন্নপূর্ণা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন—"আমার মাণিক কই?"

মাণিক জমিদারবাবুর ছোট ছেলে। ভোর হতে শুরু হয়েছে তার ভেদবমি। অন্নপূর্ণা দেবী মাণিককে কোলে করে ব'সে আছেন।

ডাক্তার এসে বলেন, "এসিয়াটিকে কলেরা, স্যালায়ইন ইন্‌জেকসন দিতে হবে।"

জমিদার-গৃহিণী ব্যাকুল হয়ে পড়েন, ডাক্তারের হাত দুটি ধরে বলেন, "ডাক্তার বাবু, আমার মাণিককে রক্ষা করুন—যেমন করেই হোক্।"

অন্নপূর্ণা দেবী মায়ের মূর্তির কাছে গিয়ে তাঁর চরণ তলে পড়ে আকুল হয়ে প্রার্থনা করেন—"মা, এ কি বিপদ হলো! মাণিককে রক্ষা করো।" করুণ-মিনতি-ভরা প্রার্থনা।

দেবী অন্নপূর্ণার আবেদন শুনতে পান। মাণিক ভাল হয়ে ওঠে।

এ ঘটনার পর থেকে জমিদারবাবুরও মন বদলে গেছে। প্রতি বছর মায়ের পূজো হয়ে আসছে। তিনি মায়ের মন্দিরের দুয়োর খুলে রাখেন। সবাই মন্দিরে এসে মায়ের পূজো করতে পারবে'—তিনি ঘোষণা করে দিয়েছেন।

বুলেটিন

সেদিন দেরি করে স্কুলে চলেছি। পথে টাউনহল পড়ে। দেখি সেখানকার বুলেটিন বোর্ডের কাছে খুব ভিড়। সবাই উৎসুক হয়ে কি যেন দেখছে। দু'বছর ধরে আমাদের যত সব খারাপ খবর—যুদ্ধের হার, ওপরওয়ালাদের অন্যায় হুকুম, এ সবই শুধু আছে। আবার হয়ত কি দুঃসংবাদ এসেছে—তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম স্কুলের দিকে।

স্কুলের পিছনে আমাদের মাষ্টার মঁাশিয়ে হ্যামেরে ছোট্ট ফুলের বাগানটিতে ঢুকে পড়লাম।

স্কুল বসবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের গোলমাল, তাদের পড়ার চীৎকার মাস্টারদের বেতের সপাং সপাং আওয়াজ রাস্তার লোকেরাও শুনতে পায়। আজ কোথাও কারো সাড়া নেই। সব নীরব। এ যেন রবিবার সকালের উপাসনা-মন্দিরের মত নিস্তব্ধ। আমি একবার

জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে নিলাম। ছেলেরা সব ব'সে আছে বেঞ্চেতে। ম্যাঃ হ্যামেলের হাতে বেতখানি রয়েছে। ধীরে ধীরে দরজা খুলে ক্লাসে গেলাম। ম্যাঃ হ্যামেল আমায় কিন্তু বকলেন না। স্নেহের স্বরে আমাকে বললেন : "ফ্রাঞ্জ্, তোমার জায়গায় গিয়ে ব'সো।—"

তখনও কিন্তু আমার রীতিমত ভয় হচ্ছিলো। ম্যাঃ হ্যামলের গায়ে সুন্দর একটা সবুজ রংয়ের কোট। মাথায় একটা কালো সিল্কের বুটিতোলা টুপি। আশ্চর্য হলাম। কখনও তাঁকে এ পোষাকে দেখিনি। সারা স্কুলটা যেন ঘুমিয়ে আছে স্বপ্নপুরীর মত। সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হলো দেখে, গ্রামের সব লোকেরা স্কুলের চারপাশে ব'সে আছে। তাদের সকলের চোখেমুখেই একটা দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে।

আমি অবাক্ হয়ে এসব দেখছি আর ভাবছি। ম্যাঃ হ্যামেল আমার দিকে তাকিয়ে অতি স্নিগ্ধস্বরে বল্লেন : "আমার প্রিয় ছাত্রগণ! এই আমার শেষ পড়া তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। বার্লিন থেকে আদেশ হয়েছে, 'এল্‌সেস ও লরেনের' বিদ্যালয়গুলিতে শুধু জার্মান ভাষাই শেখানো হবে। আসছে-কাল তোমাদের নতুন মাস্টারমশায় আসবেন। আজকের দিনের মত তোমরা মন দিয়ে শোনো।"

কথা শেষ হতেই আমার বুক কেঁপে উঠলো। 'ওঃ' এই সংবাদই তো টাউনহলের বুলেটিন বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছে।'

ম্যাঃ হ্যামেল আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। কথাটা মনে করতেও কষ্ট হয়, আর তাঁকে দেখতে পাবো না—তিনি আমাদের এই শেষ অধ্যাপনাকে শ্রদ্ধা দেখাবার জন্যই বোধ হয় নূতন পোষাক পরে এসেছেন। বুঝতে পারলাম, কেন গ্রামের লোকেরা স্কুলের ধারে ব'সে আছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধ'রে হ্যামেল এ গ্রামের সকলকে পড়িয়েছেন, হৃদয়ে গোপন বেদনা নিয়ে সবাই তাঁকে বিদায় দিতে এসেছে।—এই সব কথাই ভাবছি।

এক সময় ম্যাঃ হ্যামেল আমার নাম ধ'রে ডাকলেন। আমার

পড়া বলার পালা। আমি এক বর্ণও বলতে পারবো তা হয়তো। দুঃখ হলো আমার। কেন পারবো না? এতো আমাদের মাতৃভাষা… নিশ্চয় পারবো। বুক কাঁপতে লাগলো ভয়ে। তবু সাহস করে উঠে দাঁড়ালাম।

ম্যঃ হ্যামেল বল্লেন, "ফ্রাঞ্জ, কাল থেকে এ দেশের ভাষা ও পড়ার রীতি সব বদ্‌লে যাবে। আমাদের নিজের ব'লে আর কিছু নেই। কি নিয়ে আর গৌরব করবো? তুমি 'ফ্রেঞ্চম্যান,' কিন্তু আর তোমার মাতৃভাষা লিখতে বা পড়তে পারবে না। এর চেয়ে আর কি দুঃখ আছে? আমাদের এই ভাষা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও সহজ। মানুষ যখন পরাধীন হয় তখনো তার নিজের ভাষাকে ভুলতে পারে না। আমরাও ভুলবো না।"—তারপর তিনি বইখানি খুলে আমাদের পড়া দিতে লাগলেন।

কি সুন্দর। এত সহজ এর আগে কখনও পড়া বুঝতে পারিনি।

মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে ম্যঃ হ্যামেল পড়া বোঝাতে লাগলেন।

পড়ার পরই তিনি লিখতে দিলেন। সেদিন আমাদের জন্য নূতন 'কপিবুক' কিনে এনেছিলেন।

তার ভিতর সুন্দর করে বড় বড় অক্ষরে লেখা শুধু দু'টি কথা— 'ফ্রান্স, এল্‌সেস্‌' 'ফ্রান্স এল্‌সেস্‌'। সেগুলি দেখতে দেখতে যেন স্পষ্ট ছোট ছোট পতাকারূপে সারা ক্লাসঘর ভ'রে তুললো!

চারদিক তখন নীরবতায় আচ্ছন্ন। শুধু ছেলেদের কাগজের উপর লেখার মৃদু শব্দ। একসময় কতকগুলি চামচিকে উড়ে গেল। ছাদের উপর পায়রাগুলির মৃদু কুজন ধ্বনি। সেদিকে কারো দৃষ্টি নেই। আমি ভাবছিলাম শেষে কি এই পাখিগুলি জার্মান ভাষায় গান শিখবে?

লেখা শেষ হলো। ম্যঃ হ্যামেলের দিকে তাকালাম। চুপ করে চেয়ারে ব'সে আছেন। তাঁর চোখ দু'টি যেন ব্যগ্রভাবে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ চল্লিশ বছর ধ'রে ঐ একই চেয়ারে

ব'সে পড়াচ্ছেন তিনি সুমুখে তাঁর নিজের ফুল বাগান। স্কুলের কমপাউণ্ডের ভিতর সুপারিগাছ দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু ক'রে। ম্যঃ হ্যামেলের নিজের হাতের পোঁতা আঙ্গুরের লতাগুলি জানলা বেয়ে ছাদের উপর উঠেছে।

এসব ছেড়ে যেতে তাঁর কি কষ্টই না হবে। উপরে তাঁর পত্নী ঘরের জিনিসপত্র গুছোচ্ছেন…শব্দ শোনা যায়। তাঁরা সব কালকেই এদেশ ছেড়ে চলে যাবেন।

উঃ। সেদিনের কথা আজও ভুলতে পারিনি। এখনও বেশ স্পষ্ট চোখের উপর ভেসে ওঠে।

সহসা গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বেজে উঠল। তার পরই ঘণ্টাধ্বনি। সেই মুহূর্তেই প্রুসিয়ান সৈন্যেরা 'ড্রিল' করতে করতে এগিয়ে এলো এদিকে। সঙ্গে সঙ্গে দামামা বেজে উঠল।

ম্যঃ হ্যামেল ব'সে ছিলেন—বড় বিমর্ষ ও দুঃখিত মনে। উঠে দাঁড়ালেন।

"আমার প্রিয় ছাত্র বন্ধু"—তিনি বল্লেন, "আ…আ…আ…মি …আ"…হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। আর কিছু বলতে পারলেন না।

ব্ল্যাকবোর্ডটার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এক টুকরো খড়িমাটি নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন লিখলেন বড় বড় অক্ষরে, "বিদায় ফ্রান্স …ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হোক—" সহসা থেমে গেলেন। ধীরে ধীরে মাথাটা তাঁর এলিয়ে পড়লো দেওয়ালের গায়ে। আমাদের সকল ছাত্রকেই ইঙ্গিত করে বল্লেন—"স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। বিদায়: তোমরা এখন যেতে পারো—"

প্রুসিয়ান সৈন্যেরা তখন স্কুলের ভিতর প্রবেশ করেছে।*

* বিদেশী গল্পের অনুবাদ]

সমাপ্ত